উনিশ শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ

ও

কবি গোবিন্দ দাস

কুমুদকুমার ভট্টাচার্য

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট ॥ কলিকাতা—৭৩

পরিবেষক

UNIS SATAKER NISHIDDHA GRANTHA O KAVI
GOVINDA DAS

by

Kumudkumar Bhattacharya

প্রথম সংস্করণ
১৫ অগাস্ট, ১৯৫৭

মুদ্রক
বীরেশ্বর চক্রবর্তী
স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিণ্টার্স
১১৫এ, রাজা রামমোহন সরণী
কলকাতা—৭০০০০৯

ব্লক
ইণ্ডিকো প্রসেস
৯।৩এ, আরপুলি লেন
কলকাতা—৭০০০১২

প্রচ্ছদ শিল্পী
পান্নালাল মল্লিক

উৎসর্গ

আমার আত্মজন যারা
তাদেরি মুক্তিতে সামিল আমার মুক্তির ঘোষণা।

তাদের কথাই—স্মৃতি,
তাদের বেদনা—তাই আমার বক্তব্য।
সারা শরীরে সভ্যতার মশাল জেলে
পুড়ে অঙ্গার অন্নহারা
তারা,
আজও
প্রতারণার বধ্যভূমিতে বাঁধা
অজস্র স্পার্টাকাস—
সময় গুণছে ধৈর্যের অসংখ্য অগোচর প্রস্তুতিপর্বে।

ভূমিহীন, অর্থহীন, বঞ্চিত জীবনের
দেড় শতাধিক বছর পেরিয়ে
আজো তারা ফসলের অর্জিত অধিকারে
অনন্ত দখল বসাতে পারে নি
ঠিকই, তবু—

মাথা-নীচু বশ্যতার ক্রীতদাস নয়
তারা, নিজেরাই জানে,
হাতের লাঙ্গলে তাদের
ভুরো-করা মাটির ভালোবাসা
লক্ষকোটি কণ্ঠের শব্দে তাদের
এনে দিয়েছে সোঁদা উর্বর শস্যগন্ধের চিৎকার।

শেকলের গণ্ডী-ভেঙে-ফেলা, শাসনের দেয়াল-ফাটানো সংকল্পে
তাদের অন্তহীন যাত্রা
দীর্ঘতর হয়ে চলেছে উজ্জ্বল এক ক্রমমুক্তির দিকে—
এপার-ওপার বাংলায় সে পারাপার স্বরু থেকে আজো ক্লান্তিহীন
গ্রামেগঞ্জে মানুষের বিপুল মুক্তি আজো তাই

আশায় উদ্যমে অপেক্ষায়
একটি মাত্র
জলোচ্ছ্বাসের জন্য স্থির হয়ে আছে।

আমার অভিনন্দন ছড়িয়ে দিয়েছি দুই বাংলার
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সংগঠিত মানুষের স্মরণে।
শ্রদ্ধায় অভিভূত উৎসর্গে
আমার এই কুড়িয়ে-পাওয়া দলিলের সমগ্র ইতিহাস
তাই পাতায় পাতায় তুলে দিলাম তাদেরই হাতে হাতে
এই সামান্য গ্রন্থের আগাগোড়া কৃতজ্ঞতায়।

শ্রেণীহীন নতুন মানুষের চোখেই ফুটে উঠুক
সেই রৌদ্রের আভা।

আমার রচনায় যৌবন এনে দিক নিরক্ষরের প্রেম।

সূচীপত্র

ভূমিকা

* শ্রমজীবীদের দেহ হইতে আমাদের জন্ম, তাহাদের স্বাধীনতা আমাদের স্বাধীনতা, তাহাদের শক্তি আমাদের শক্তি। তাহারাই গাছের মূল কাণ্ড ; বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা এইগুলি বিভিন্ন শাখামাত্র। কাণ্ড যদি দুর্বল হইয়া যায় তবে শাখাও শুকাইয়া যাইবে। ...শ্রমিকেরা যে পথ গড়িতেছে বুদ্ধিজীবীদের তাহা আলোকিত করিতে হইবে। তাহারা দুইটি বিভিন্ন মজুরের দল। কিন্তু কাজের লক্ষ্য এক।—রম্যাঁ রলাঁ।

* বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি ও কারিগরির ক্ষেত্রে মানুষের যে সব সত্যকার সুন্দর, মূল্যবান ও চিরকালের কল্যাণকর সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে সে-সব সৃষ্টি করেছেন যাঁরা, তাঁদের কী অবিশ্রান্ত প্রতিকূল অবস্থার অধীনে থেকে সমাজের অপরিসীম অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে—ধর্মযাজকদের প্রচণ্ড বিরোধিতা, পুঁজিপতিদের স্বার্থোদ্ধারের প্রচেষ্টা এবং বিজ্ঞান ও শিল্পকলার "পৃষ্ঠপোষকশ্রেণীর" অতি লোভী চাহিদার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই ইতিহাস আপনাদের জানতে হবে।—ম্যাকসিম গর্কি।

মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের শোষণ-মুক্তির ইতিহাস এবং অকুতোভয় সংগ্রামী নায়কদের কাহিনী প্রচলিত ইতিহাসে একান্তভাবেই অনুপস্থিত। ইতিহাসে যাঁদের গৌরব-গাথা কীর্তিত হয়েছে, শ্রেণী বিচারে তাঁরা পরস্বাপহারক ; দুর্বল শ্রেণীর শ্রম-শোষণে তাঁরা নির্ভরশীল। ভয়ঙ্কর অত্যাচারী-রূপে তাঁরা জন-জীবনে আতঙ্কের কারণ হলেও ইতিহাসে মহৎ-সজ্জন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ধনশক্তি শাসিত সমাজে এভাবেই ইতিহাসের বিকৃতি ঘটেছে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণী-নিরপেক্ষ ইতিহাস-রচনা অলীক কল্পনা মাত্র। দেশ, সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় শোষক-শক্তির প্রসাদ-ভিক্ষু ইতিহাসকারেরা যে-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন, তা শ্রেণীস্বার্থে আচ্ছন্ন ও খণ্ডিত। এঁদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে রম্যাঁ রলাঁ বলেছেন, "শোষণকারীরা যে সম্মান ও সুযোগ সুবিধা তাদের দেয়, তাতেই কৃতার্থ হয়ে তারা জন-সাধারণের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।" তাই পরশ্রমজীবীদের

শ্রেষ্ঠত্বের অভিধায় ভূষিত করার জন্য তাঁরা একদিকে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করেছেন, অন্যদিকে সংগ্রামী ইতিহাস-পাঠে উত্তরসূরিরা যাতে শৃঙ্খল-মুক্তির সংগ্রামে উৎসাহিত না হন, সেজন্য তাঁরা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কাহিনী বিনষ্ট করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবুও মানব-মুক্তির রক্ত-রঞ্জিত কাহিনী ও তার মহান নায়কদের শ্রমজীবীশ্রেণীর মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। কাল থেকে কালান্তরে পৌঁছেও তাঁরা বেঁচে থাকেন শোষিত-অবহেলিত মানুষের হৃদয়-কন্দরে।

আমাদের দেশে যাঁরা ইতিহাস লিখেছেন, তাঁরা কেউই উনিশ শতকের সাহিত্যজগতের সংগ্রামী নায়কদের তদানীন্তন আর্থনীতিক-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করেননি, এমনকি তাঁদের লেখনীতে এঁদের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদাও প্রদর্শিত হয়নি। সমাজ-বিকাশে রামমোহন-বঙ্কিমের উজ্জ্বল চিত্রাঙ্কনে তাঁরা যে-পরিমাণে উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন, ঠিক সম-পরিমাণেই তাঁদের অনীহা ডিরোজিও-গোবিন্দ দাসের প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। অথচ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং দ্বিতীয়ার্ধে ভাওয়ালের স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস সামন্ত-শক্তির বিরুদ্ধে অসম সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। সামন্তপ্রভুদের পীড়ন-কৌশলে অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও নৃপতি-ভূস্বামী সমাজের কাছে তাঁরা নতজানু হননি; শ্রমশক্তির ক্রেতাদের কাছে তাঁরা নিজেদের বিক্রি করেননি। শোষিতশ্রেণীর স্বার্থের বিনিময়ে তাঁরা সমৃদ্ধপূর্ণ ভবিষ্যত ক্রয়ে একান্তভাবেই নারাজ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বিপ্লবী বাংলার সংগ্রামী স্বপ্নের প্রতীক।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ডিরোজিও বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে যে সামন্তবিরোধী গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রবর্তন করেছেন, তারই ধারক-বাহকরূপে গোবিন্দ দাস দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হয়েছেন। নিরন্ধ্র তমসাচ্ছন্ন দিনগুলি ভারী হয়ে উঠেছে অসহায় মানুষের আর্ত ক্রন্দনে। ভূমিস্বার্থে পরশ্রমজীবী-সমাজ যখন ভূতের মতো পিছন দিকে হেঁটে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত, প্রজা-শোষণ করাকে যখন তাঁরা বিধিদত্ত অধিকার বলে মনে করতেন, তখন গোবিন্দচন্দ্র অবহেলাভরে রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি ত্যাগ করে সামন্ত-যন্ত্রে পিষ্ট মানুষগুলিকে বুকে টেনে নিয়েছেন; অথচ অন্যান্যদের ন্যায় তিনি যদি চোখ বুজে থাকতেন, তবে তিনিও প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামী-রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন এবং

প্রতিভাবান কবি-রূপে ভূম্যধিকারীসমাজের কাছ থেকে সম্মান-সম্বর্ধনা লাভ করতেন। কিন্তু কৃষক-প্রজাদের রক্তে সিক্ত অর্থে তিনি জীবন নির্বাহ করতে চাননি। সামন্ত-শাসিত সমাজে নৃপতি-ভূস্বামীদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গোবিন্দ দাস লাঞ্ছিত-উৎপীড়িত রায়ত-কৃষকদের সমর্থন করেছেন, তাঁদের অন্ধকারময় জীবনের মর্মবেদনাকে বাণীরূপ দিয়েছেন।

কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের আপোষহীন জীবন সংগ্রাম, সামন্ত-বিরোধী চেতনায় সমৃদ্ধ ও জীবন-রসে সিক্ত কবিতাবলী সাহিত্যেতিহাসের লেখকদের কিংবা সাহিত্য-সমালোচকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। তাঁরা একালের পাঠকদের কাছে গোবিন্দ দাসকে দেহবাদী কবি-রূপেই উপস্থিত করেছেন ; তাঁর কবিতায় তাঁরা কেবলমাত্র 'বলিষ্ঠ দেহানুগত্য' লক্ষ্য করেছেন। তেলা মাথায় তেল দিতে গিয়ে আমরাও বিস্মৃত হয়েছি আমাদের সংগ্রামী অতীতকে এবং শৃঙ্খলমুক্ত জীবনের স্বপ্নদর্শী কবি গোবিন্দ দাসকে।

একালের সমাজ-সচেতন পাঠকদের কাছে গোবিন্দ দাস প্রায়-অপরিচিত একটি নাম। অথচ রায়ত-প্রজাদের স্বার্থে কবির আজীবন সংগ্রাম এবং শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে রচিত তাঁর কবিতাবলী সেকালের মানুষকে অনুপ্রাণিত-উদ্দীপিত করেছিল। বর্তমানে দুই বাংলার শ্রমজীবী-কৃষিজীবীসমাজ যখন শৃঙ্খল-মোচনের সংগ্রামে রত, তখন তাঁদের সামনে বাংলা সাহিত্যের সংগ্রামী অতীতকে তুলে ধরা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখেই উনিশ শতকের সামাজিক-আর্থনীতিক পটভূমিতে রায়ত-প্রসঙ্গে স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামী ভূমিকা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। তাঁর কবিতাবলী মূল্যায়নের সময়ে স্মরণে রেখেছি, "A work of literature will always reflect, whether consciously or unconsciously, the psychology of the class which the writer represents. Either this or, as often happens, it reflects a mixture of elements in which the influence of various classes on the writer is revealed, and this must be subjected to a close analysis." —Anatoly Lunacharsky.

কিন্তু এই কাজে অবতীর্ণ হয়ে প্রতি পদেই অনুভব করেছি, কাজটি দুঃসাধ্য প্রায়। যে-সকল কবিতায় গোবিন্দ দাসের ভূস্বামী-বিরোধী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, ভূমি-নির্ভর সারস্বত সমাজের সযত্ন প্রয়াসে সেগুলির

অনেকাংশে অবলুপ্ত। তাছাড়া গোবিন্দচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু তথ্যের একান্ত অভাব। যেমন, ভাওয়ালের বিধবা রাণীর কাছে লিখিত আবেদনপত্রে যে ৫১জন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাক্ষর দিয়েছিলেন, তাঁদের সকলের নাম বহু চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে পারিনি। তেমনি পাওয়া যায়নি 'নবযুগ' পত্রিকায় রাজেন্দ্রনারায়ণ ও কালীপ্রসন্নের বিরুদ্ধে প্রকাশিত সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি কিংবা তার অংশবিশেষ। এবং গোবিন্দ দাস-রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার-জনিত ফলাফলের নির্ভরযোগ্য তথ্য-সংগ্রহের ক্ষেত্রে আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছি। তাছাড়া 'মগের মুলুক' কাব্যটি প্রকৃতই আদালতের আদেশে নিষিদ্ধ হয়েছিল কিনা সে-সম্পর্কেও সঠিক তথ্যের একান্ত অভাব। 'মগের মুলুক'-এর বিরুদ্ধে মামলার বিবরণ তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও উপরোক্ত আদেশ সম্পর্কে কোন সংবাদ উল্লিখিত হয়নি। গোবিন্দ দাসের জীবনীকার শ্রী হেমচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর গ্রন্থে এ-সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে তিনি এই মামলা সম্পর্কে বিচারকের যে মন্তব্য উল্লেখ করেছেন, তাতে দেখা যায় এই মামলা আপোষে নিষ্পত্তি ঘটেছে। সমকালীন লেখকদের মধ্যে কেবলমাত্র কামিনীকুমার সেন মহাশয় আদালতের আদেশে 'মগের মুলুক' নিষিদ্ধ হবার সংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এই সংবাদের সূত্র উল্লেখ করেননি। একমাত্র ঢাকা আদালতের পুরাতন নথিপত্র সন্ধান করতে পারলে এ-সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যেত। কিন্তু একই ভাষাভাষী অঞ্চল হলেও ঢাকা আজ আমাদের কাছে বিদেশ।

উনিশ শতকের বাংলাদেশ ছিল সামন্ত-শোষণে জর্জরিত। পাশ্চাত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই শতকের খ্যাতনামা নায়করা সামন্ত-সমাজের আমূল পরিবর্তনের পরিবর্তে কেবলমাত্র সমাজের উপরিভাগ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন; ভূমি-নির্ভরতা তাঁদের চিন্তাধারাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে ভূমিস্বার্থ-সম্পর্ক বিরহিত গোবিন্দচন্দ্র সামন্ত-শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর কবিতাবলীতে। বক্ষ্যমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হল গোবিন্দ দাসের সামন্ত-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি, সহায়-সম্বলহীন রায়ত-কৃষকের প্রতি গভীর দরদ ও শোষিত মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি সম্পর্কে অবিচল আস্থা। সেকারণে রাজনীতিক ও অন্যান্য সামাজিক প্রশ্নে কবির চিন্তাধারা সম্পর্কে কোনো আলোচনা এখানে করা হয়নি। তবে গোবিন্দচন্দ্রের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনের জন্য গ্রন্থভুক্ত একাদশ অধ্যায়ের 'নির্বাচিত কবিতাবলী'তে

রাজনীতি ও সমাজ-বিষয়ক কবিতা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

গোবিন্দ দাসের স্বাদেশিক চিন্তা ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাবে 'আমরা হরিহর', 'স্বদেশ', 'স্বাধীনতা' ইত্যাদি কবিতায়। 'আমরা হরিহর' কবিতাটি বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। অনেকের ধারণা, 'স্বদেশ' কবিতা চারণকবি মুকুন্দ দাসের রচনা। কিন্তু তা যথার্থ নয়। গোবিন্দ দাসের রচিত এই কবিতাটি বিশ শতকের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের যুব-মানসকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। স্বভাব-কবির রাজনীতিক চেতনা সম্পর্কে সংক্ষেপে মন্তব্য করা যায় যে, তৎকালীন জাতীয় নেতাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাবে তিনি রাজনীতি-বিষয়ক কবিতাবলী রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ বৃটিশসাম্রাজ্যশক্তির নিষ্ঠুর শোষণের ভয়াবহ চিত্র অঙ্কন করলেও এবং তজ্জনিত মর্মদাহী যন্ত্রণা অনুভব করলেও গোবিন্দচন্দ্র ভারতবাসীদের প্রতি শ্বেত শাসকদের শুভ ইচ্ছা সম্পর্কে আস্থা জ্ঞাপন করে তাঁদের কাছে ভূস্বামীশ্রেণীর অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য আবেদন করেছেন। ইংরেজ-শাসনের নিরপেক্ষতায় ও প্রজা-হিতৈষণায় আস্থা স্থাপন করে 'ভাওয়াল (৪)' কবিতায় তিনি লিখেছেন,

> "নাহিক ইংরাজরাজ্যে চৌরদস্যুভয়,
> জানে না ইংরাজপ্রজা প্রবল-পীড়ন,
> ছাগে বাঘে জল খায় একত্র উভয়,
> ইংরাজ প্রজার বন্ধু রাজা অতুলন!"

গোবিন্দ দাসের সমাজ-বিষয়ক কবিতায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শাণিত তরবারির বিদ্যুৎ ঝলকানিতে সমাজ-শত্রুদের মুখোস উন্মোচিত হয়েছে। তবে 'বিক্রমপুরে বসন্ত' ইত্যাদি জাতীয় কবিতার কোন কোন স্থলে ব্যক্তি-বিদ্বেষের প্রকাশ ঘটেছে—শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে যা একান্তই অনভিপ্রেত। কিন্তু কবিকে এজন্য দায়ী করা যায় না। সেই সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা তিনি এমনভাবে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হয়েছেন যে, কবিতা-রচনাকালে তিনি তাঁদের অত্যাচার-অবিচারের ঘটনাগুলি মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হতে পারেননি। স্বভাবকবির সীমাবদ্ধতা উপলব্ধির জন্যই কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের অমুলিখিত 'মগের মুলুক' কাব্য অসংশোধিত রূপে গ্রন্থ-ভুক্ত করা হয়েছে। এই কাব্যটি উনিশ-বিশ শতকের সংক্রান্তিকালের একটি ঐতিহাসিক দলিল। কবিতাকারে রূপায়িত এই মূল্যবান দলিলে তৎকালীন সামাজিক-রাজনীতিক-আর্থনীতিক

চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ইতিহাসকে বিকৃত কিংবা খণ্ডিত রূপে উপস্থিত করা যায় না। সুতরাং এই কাব্যের কোন কোন স্থানে অসহিষ্ণুতা, অশালীনতা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রকাশ ঘটলেও পুনর্মুদ্রনকালে তা সংশোধন করার অধিকার কারোর নেই। তাছাড়া 'মগের মুলুক'কে কেন্দ্র করেই কবি-জীবন আবর্তিত হয়েছিল।

'নির্বাচিত কবিতাবলী'তে স্বভাবকবির সামন্ত-বিরোধী চিন্তাধারার একটা ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা গোবিন্দ দাসকে একটা সার্বজনীন সত্যে পৌঁছে দিয়েছিল। বস্তুবাদী সাহিত্য অধ্যয়নের সুযোগ পাওয়া তো দূরের কথা, তিনি পশ্চিমী শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাননি। তবুও তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে-সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, তার সঙ্গে একালের বস্তুবাদী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কোনো অমিল নেই। ভিন্ন কালের হলেও দুই কবির সত্যোপলব্ধি ছিল এক —শোষিত মানুষের মুক্তি সাধনায় রত ছিলেন দুই কালের দুই কবি। স্বভাবকবির সংগ্রামী সাহিত্যধারার সার্থক উত্তরসূরি ছিলেন কবি সুকান্ত। আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক'-এ আমি যে-কথা ইঙ্গিতে বলেছিলাম, তা এখানে স্পষ্ট করে বলা আবশ্যক। কবি সুকান্ত বাংলা কাব্যজগতে স্বয়ম্ভু নন। তিনি যে-সুরে সংগ্রামের গান গেয়েছেন, তা অভিনব হলেও বাংলা কাব্যসংসারে অপরিচিত নয়। অনেকের আস্বাদনে আমরা শুনতে পেয়েছি 'মহাজীবন'-এর গায়ক সুকান্তের কণ্ঠে 'বিদ্রোহের গান'।

উনিশ-বিশ শতকের সংক্রান্তিকালে শ্রেণীচেতনার বিকাশ না ঘটায় গোবিন্দ দাস সামন্ত-প্রভুদের শ্রেণী-শত্রুরূপে চিহ্নিত করতে পারেননি। সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাবের বিলম্বতার জন্য স্বভাবকবি মধ্যপথে অসমাপ্ত। নৃপতি-ভূস্বামীদের প্রতি আত্যন্তিক ঘৃণার মূলে ছিল কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির তীব্রতা। তিনি যেমন 'মগের মুলুক' কাব্যে ও অন্যান্য কবিতায় ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায়ের উদারতা ও বদান্যতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, তেমনি রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ও সাধারণভাবে ভূস্বামীশ্রেণীর এবং কালীপ্রসন্ন ও ভূমি-নির্ভর চাটুকারদের প্রতি তাঁর সুতীব্র ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে। কবির এই সীমাবদ্ধতার কারণ ছিল সমকালীন সামাজিক ও রাজনীতিক পরিবেশ।

তাসত্ত্বেও গোবিন্দ দাসের কাব্য-কবিতায় নেতিবাচকতার তুলনায় ইতি-

বাচকতাই প্রধান। শ্রেণীবিদ্বেষের পরিবর্তে ব্যক্তিবিদ্বেষের প্রকাশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটলেও সামগ্রিকভাবে তাঁর রচনায় শৃঙ্খলিত মানবাত্মার মুক্তির আকুতি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অমানিশার অন্ধকারে কবি সূর্যোদয়ের স্বপ্ন দেখেছেন, একাকী ভৈরবী রাগিণীতে নিশ'বসানের সঙ্গীত গেয়েছেন।

সমকালীন সমাজের পটভূমিতে কবি গোবিন্দ দাসের বস্তুবাদী মূল্যায়নের চেষ্টা করেছি। এই প্রয়াস সফল হয়েছে কিনা তা বিচার করবেন সমাজ-সচেতন পাঠকসমাজ। দুই বাংলার সংগ্রামী জন-মানসে কবি গোবিন্দ দাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এই গ্রন্থ যদি কিছুমাত্র সাহায্য করে, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

গোবিন্দ দাস সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছি, তাঁর রচিত কাব্য-কবিতা দুর্লভ, তৎকালীন পত্র-পত্রিকার একান্ত অভাব। কিন্তু সেই দুস্তর বাধা অতিক্রম করতে আমাকে সাহায্য করার জন্য অনেকে এগিয়ে এসেছেন; তাঁদের অকৃপণ সহায়তা এই শ্রমসাধ্য কাজে ব্রতী হতে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রাচীন পত্র-পত্রিকা ও স্বভাবকবির রচনা-সংগ্রহে সাহায্য করেছেন গোবিন্দ দাসের পুত্র শ্রী হেমরঞ্জন দাস, কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী মনুজেন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রী সুধীররঞ্জন চক্রবর্তী, কবি অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেহালা কলেজ অব কমার্সের অধ্যক্ষ শ্রী সুনীলকুমার রায়, সাহিত্য অকাদেমির আঞ্চলিক সচিব ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রী মিহির আচার্য, অধ্যাপক নন্দদুলাল দাস, অধ্যাপক অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন্ধুবর শ্রীশিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

স্মরণ করি, জাতীয় গ্রন্থাগারের সেই অফিসার মহাশয়কে। দিল্লী থেকে আগত এই ভদ্রলোকটি জরুরী অবস্থার সুযোগে স্ফীত হয়ে আমাকে গ্রন্থাগার থেকে বহির্গমনের সুদীর্ঘ সিংহ-দরজাটি দেখিয়েছিলেন। আমার অপরাধ ছিল, আমার দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতার জন্য 'মাইক্রো-ফিল্ম রিডার'-এ মাইক্রো-ফিল্ম দেখার অসুবিধার কথা তাঁকে জানিয়ে অনুরোধ করেছিলাম আমাকে যেন বহু পুরাতন জীর্ণ সংবাদপত্র দেখার সুযোগ দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে দেখেছি, জরুরী অবস্থার হিংস্র দংশনের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে আমার মতো সাধারণ পাঠককে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন সেই বিভাগের কর্মী শ্রী সুকুমার দাস। কেবল-

মাত্র তিনি নন, অস্বাস্থ্যকর-অন্ধকারময় পরিবেশে শ্রী দিলীপকুমার দাস, শ্রী অচিন্ত্য মল্লিক, শ্রী নিখিল দত্ত প্রমুখ জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীরা অন্যান্য পাঠকদের মতো আমাকেও সাহায্য করেছেন। একইভাবে সহযোগিতা করেছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মীরা। তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

গ্রন্থ-প্রণয়নে যেমন সহযোগিতা পেয়েছি, তেমনি আমাকে নিরুৎসাহিত করার প্রয়াসও লক্ষ্য করেছি। কালীপ্রসন্নের জনৈক হিতৈষী আমাকে চিঠিতে লিখেছেন, "আপনি কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও গোবিন্দ দাস সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিতে চাহিয়াছেন। যুক্তভাবে উহাদের নিয়া কোন কিছু লেখা উচিত নয়।" কেন উচিত নয়, কেন এই দ্বিধা, তা পত্রলেখক স্পষ্ট ভাষায় বলেননি। মহত্বের মুখোস উন্মোচিত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি সম্ভবত আমাকে পুস্তক-প্রকাশে নিরস্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শের প্রতি আমার সুগভীর শ্রদ্ধা রয়েছে বলেই আমি এই গ্রন্থ-প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি।

পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে ও অন্যান্য কাজে সাহায্য করেছেন আমার সহধর্মিনী শ্রীমতী অমলা ভট্টাচার্য—তিনি আমার ধন্যবাদার্হ। পাণ্ডুলিপি নকল করেছেন আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান অশোক মিশ্র। তাকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

কয়েকটি ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে। গ্রন্থশেষের শুদ্ধিপত্রে সেগুলি সংশোধন করা হল। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য সহৃদয় পাঠক-সমাজের কাছে মার্জনা চাইছি। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, উদ্ধৃতি এবং স্বভাবকবির মুদ্রিত কবিতা ও চিঠি এবং অমুলিখিত মগের মুলুক' কাব্যে একই শব্দের বিভিন্ন বানান লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী সংশোধন করা হয়নি, যথাযথ রাখা হয়েছে। সেগুলি মুদ্রণ প্রমাদ নহে।

কুমুদকুমার ভট্টাচার্য

এই লেখকের রচিত

শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক
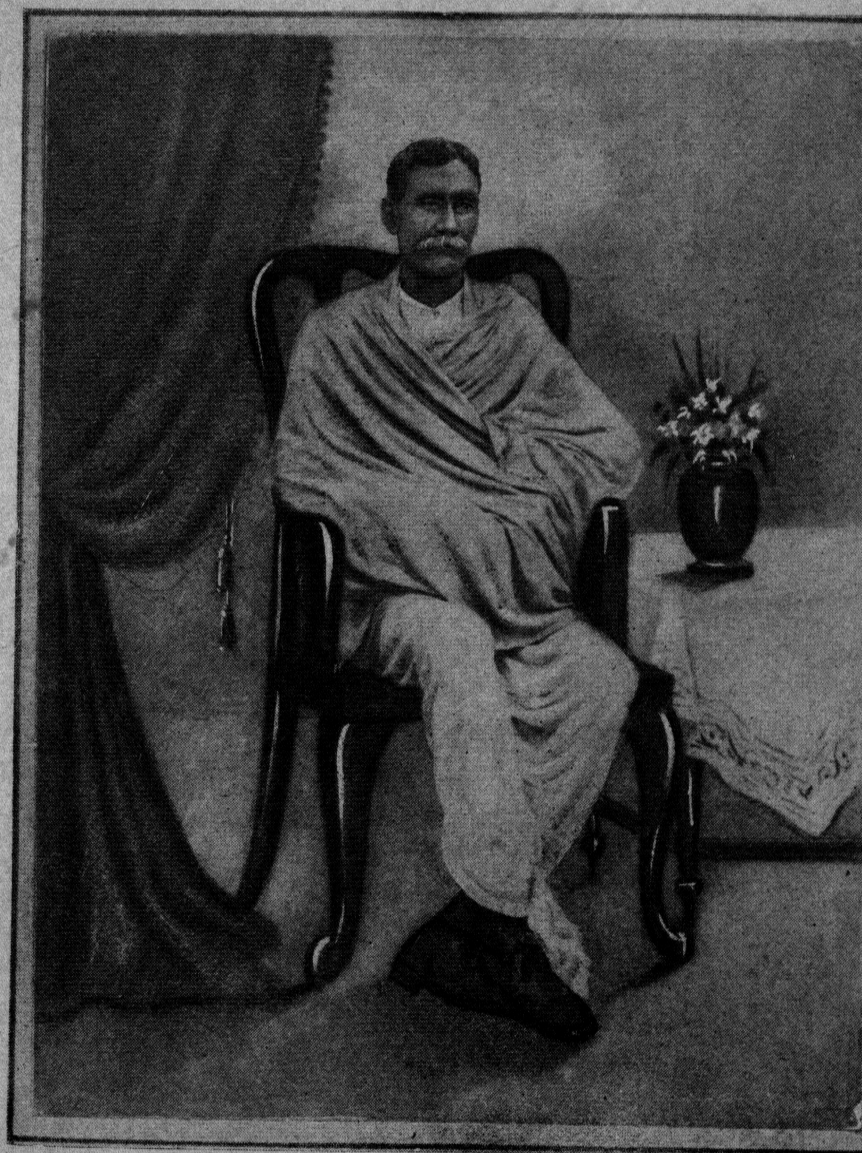
গোবিন্দচন্দ্র দাস

জন্ম : { ৪ মাঘ, ১২৬১ / ১৬ জানুয়ারী, ১৮৫৫ } ● মৃত্যু : { ১৩ আশ্বিন, ১৩২৫ / ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৮ }

প্রথম অধ্যায়

কবি গোবিন্দদাস ও ভাওয়াল-বঙ্গদেশের ভূস্বামীশ্রেণী

উনিশ শতকের ভাওয়াল ছিল অরণ্যসঙ্কুল হিংস্র বন্য পশুর আবাসস্থল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভাওয়ালের কালেক্টর লিখেছেন, "অরণ্যের অর্ধাংশ ছিল বন্য হস্তী ও হিংস্র পশুর বিচরণস্থল।"[১] বাংলাদেশে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "এই বিভাগের উত্তর সীমা ময়মনসিংহ, পূর্ব্ব সীমা লক্ষ্মা নদী মহেশ্বরদী এবং সোণার গাঁও ; দক্ষিণ সীমা বুড়ীগঙ্গা নদী, পশ্চিম সীমা তুরাগ নদী এবং চন্দ্রপ্রতাপ। এই বিভাগের কোন২ স্থান তুরাগ নদীর পশ্চিম এবং লক্ষ্মার পূর্ব্ব পারও আছে কিন্তু নৈসর্গিক বিভাগানুসারে ঐ সকল স্থান চন্দ্রপ্রতাপ এবং সোণার গাঁয়ের অন্তর্গত। এই বিভাগের দক্ষিণাংশে ঢাকা নগরী সংস্থাপিত। জয়দেবপুর, টৌক, টঙ্গী, রূপগঞ্জ, কাপাইসা, ডেমরা, একডালা এবং জামালপুর ইহার প্রসিদ্ধ গ্রাম।"[২] ভাওয়াল পরগণার গ্রাম-সংখ্যা ২৭৯[৩] এবং মোট জমি 'প্রায় ৫৭৯ বর্গমাইল অর্থাৎ ১১২০৯৪৪ বর্গাবিঘা ভূমি আছে। লোকসংখ্যা প্রায় ৬৫৩৮৬, তন্মধ্যে হিন্দু ২৭৬০৫ ও মুসলমান ৩৭৭৮১, ভাওয়ালে ভদ্রলোকের সংখ্যা অতি অল্প। ভাওয়ালের অধিকাংশ ভূমিই পতিত ও জঙ্গলময়। এ স্থানে কোনও বৃহৎ নদী নাই। কেবল বালু ও টঙ্গী নদী নাম্নী দুইটি ক্ষুদ্র নদী আছে। ভাওয়ালের অধিকাংশ ভূমিই উচ্চ এবং সর্ব্বত্র সমতল নহে। জয়দেবপুরের কিয়দ্দূর উত্তর হইতে উত্তরে বহুদূর পর্য্যন্ত গজার বৃক্ষে পরিপূর্ণ। ইহাতে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল বাস করে। ভাওয়ালে হিন্দু, মুসলমান, ফিরিঙ্গী, বনুয়া প্রভৃতি বাস করে। এখানকার বংশী ও কোচ নামক দুইটি'[৪] পার্বত্যজাতি উল্লেখযোগ্য।

ঢাকা জেলার অধিবাসীদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: বৃহৎ ভূস্বামী, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষক, কারিগর, তাঁতি, মাঝি এবং কুলিশ্রেণী। বৃহৎ ভূস্বামীরা সংখ্যায় অল্প ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য পেশা থেকে লব্ধ অর্থ জমিতে লগ্নি করায় তাঁদের সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটেছে। সাহা ও কিয়ৎ পরিমাণে তেলী সম্প্রদায় ছিল ঢাকার প্রধান ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং তাঁদের মধ্যে

অনেকেই মহাজনী ব্যবসার মুনাফা দিয়ে জমি কিনে ভূস্বামী হয়েছেন।[৫] চাকুরিজীবীরাও মধ্যস্বত্বাধিকারী-রূপে ভূমি-নির্ভর ছিলেন।

স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের জন্মকালে ভাওয়ালের জমিদার ছিলেন রাজা কালীনারায়ণ রায়। এই বংশের জমিদারি-লাভ সরল পথে ঘটেনি, বাঁকা পথে তাঁদের ঘরে লক্ষ্মীর আবির্ভাব। বিশ্বাসঘাতকতা ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কালীনারায়ণের ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ বলরাম রায়চৌধুরী ওরফে জানকীনাথ রায়চৌধুরী ভাওয়ালের জমিদারি লাভ করেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনীর বিখ্যাত পুশিলাল ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত খ্যাতনামা পণ্ডিত রত্নেশ্বর ভট্টাচার্যের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ বলরাম ভাওয়াল-ভূস্বামী দৌলত গাজীর দেওয়ান ছিলেন।

'ভাওয়ালের অন্তঃপাতী চৈরাগ্রামে যবন জাতীয় গাজী বংশীয়েরা বিলক্ষণ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। তদ্বংশীয় পহন্নুন সা গাজী সম্রাটের নিকট হইতে বর্ত্তমান চাঁদপ্রতাপ, কাশীমপুর, তালেপবাদ, স্থলতানপ্রতাপ ও ভাওয়াল—এই পাঁচ পরগণা একত্রে বন্দোবস্ত করিয়া লন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী সা করকরমা গাজী ঐ জমিদারী ভোগ করেন। ইনি ছয় পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে সমস্ত জমিদারী পুত্রগণকে বিভক্ত করিয়া দিয়া যান এবং পুত্রদের প্রত্যেকের নামানুসারে যার যার অংশের নাম রাখা হয়। "ভাওয়াল গাজী" নামক এক পুত্রের নামানুসারে এই দেশের নাম ভাওয়াল পরগণা রাখা হয়। বড় গাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহাদুর গাজী কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। তৎপর তাঁহার পুত্র মহাতাপ গাজী, তৎপর তৎপুত্র ফাজীল গাজী, তৎপর তৎপুত্র নূর গাজী কর্ত্তৃত্ব করেন। নূর গাজীর পুত্র হীরা গাজী ও দৌলত গাজী ইঁহারা ক্রমে ভাওয়ালের কর্তৃত্বপদ লাভ করেন। হীরা গাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দৌলত গাজী শাসন কর্ত্তা হন।'[৬]

বজ্রযোগিনীর রত্নেশ্বর ভট্টাচার্যের প্রপৌত্র কুশধ্বজ চক্রবর্তী মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে উকিল ছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে নবাব তাঁকে 'রায়' উপাধি প্রদান করেন। নবাব সরকারে কর্মকালে কুশধ্বজ দৌলত গাজীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং জয়দেবপুরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত চাঁদনা গ্রামের জায়গীরদারি লাভ করেন। মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে কিছুদিন চাঁদনা গ্রামে বসবাস করার পরে তিনি দৌলত গাজীর প্রধান দেওয়ানি পদে নিযুক্ত হন।

কুশধ্বজ রায় ধীরে ধীরে প্রবীণ কর্মচারীদের বিতাড়িত করে জমিদারি পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে স্বীয় বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর পুত্র বলরাম রায় দেওয়ানি পদে নিযুক্ত হন এবং তাঁর কূটকৌশলে ভাওয়ালের রাজলক্ষ্মী 'পুশিলালের ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। ভাওয়ালের জমিদারী গাজী মুনিবের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী ৺জানকীনাথ রায়ের নিজস্ব হইয়া পড়িল।'[৭]

বলরাম রায় ভাওয়ালে জানকীনাথ রায় নামে পরিচিত হন। প্রজা-বিক্ষোভের ভয়ে জানকীনাথ একাকী ভাওয়ালের সম্পূর্ণ জমিদারি গ্রহণ না করে কালীকিশোর ঘোষচৌধুরীর (কালীনারায়ণ রায়ের পিতা গোলকনারায়ণের সমকালীন ভাওয়ালের সাত আনির জমিদার) পূর্বপুরুষকে সাত আনি, পানাসোণার পূর্বপুরুষকে দুআনি দিয়ে জমিদারি লাভ করেন। তাসত্ত্বেও তাঁদের জমিদারি-লাভ নির্বিঘ্নে ঘটেনি। বিক্ষুব্ধ প্রজাদের রক্তে স্নান করে তাঁরা জমিদারী-ক্ষমতা পেয়েছিলেন এবং নবাব-দরবারে প্রচুর উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। নবাব খুশি হয়ে জানকীনাথ রায়কে 'চৌধুরী' উপাধি প্রদান করেন। জানকীনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় হিজরি ১০৮৮ সালে ৬ই জেলহজ্জ তারিখে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে জমিদারির সনদ লাভ করেন এবং চাঁদনা গ্রাম ত্যাগ করে 'পীড়াবাড়ী' নামক স্থানে নতুন বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র জয়দেব রায় পানাসোণার দুআনি অংশ হস্তগত করে নয় আনি অংশের মালিক হওয়ায় অধিকতর প্রতাপান্বিত হন এবং 'পীড়াবাড়ী'র নাম পরিবর্তন করে 'জয়দেবপুর' নাম রাখেন।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের দেওয়ানি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জয়দেবের প্রপৌত্র কোম্পানি-অনুগত লোকনারায়ণকে ভাওয়ালের জমিদার-রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। '১১৯৮ সনে লোকনারায়ণ রায়চৌধুরী ও কৃষ্ণশ্যাম-কিশোর চৌধুরীর নামে ২৫১৬০ টাকা সিক্কাতে ভাওয়াল সম্বন্ধে দশশালা বন্দোবস্ত হয় এবং তৎপর ১২০১ সালে ৷৷/০ আনি ৯নং মহাল ১১৭৭৪ টাকা সিক্কাতে লোকনারায়ণ রায়চৌধুরীর নামে এবং ।৶০ আনি ১০ নং মহাল ১৩৩৩৮৬ টাকা সিক্কাতে কৃষ্ণশ্যামকিশোর রায়চৌধুরী নামে পৃথক তালুক হইয়া পড়ে।'[৮] ইতিমধ্যে লোকনারায়ণের বংশে জমিদারি-দখলের ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছিল এবং তাতে লোকনারায়ণের ভ্রাতা নরনারায়ণকে খুন করা হয়।

লোকনারায়ণ ছিলেন স্বৈরাচারী শক্তিধর পুরুষ। তাঁর যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর পুত্র গোলকনারায়ণের বয়স মাত্র তিন বৎসর। জমিদারি-ক্ষমতা দখলের লোভে পুনরায় রাজপ্রাসাদে দেখা দেয় ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত। জ্ঞাতি-কুটুম্বদের চক্রান্তে লোকনারায়ণের বিধবা স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী দেবী নাবালক পুত্র-সহ রাজগৃহ থেকে বিতাড়িত হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনি কোম্পানি-সরকারের সাহায্যে পুনরায় ভাওয়ালের জমিদারি লাভ করেন। এইভাবে কালীনারায়ণ রায়ের পিতা গোলকনারায়ণ রক্ত-পিচ্ছিল পথে পুনরায় ক্ষমতা দখল করেছেন। কালীনারায়ণ ছিলেন পূর্বপুরুষদের যোগ্য উত্তরাধিকারী। সশস্ত্র শক্তিপ্রয়োগে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ; দাঙ্গা, খুন ইত্যাদিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর আমলের প্রথম দিকে ভাওয়ালের সাত আনির অংশীদারদের কাছ থেকে সাত আনি কিনে নিয়ে জমিদার হয়েছিলেন ঢাকার বিখ্যাত নীলকর মিঃ ওয়াইজ্। কিন্তু এক আকাশে দুটি সূর্য থাকতে পারে না এবং কুড়ি বৎসরের যুবক কালীনারায়ণ তা সহ্য করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং জমির মালিকানা নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হল। বহু খুন জখমের পরে মিঃ ওয়াইজ্ পশ্চাদ্‌পসরণ করতে বাধ্য হলেন। তিনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৪,৪৬,০০০্ টাকার বিনিময়ে তাঁর সাত আনির জমিদারি কালীনারায়ণের কাছে বিক্রি করে দিলেন। এতদিনে ভাওয়ালের ষোল আনি জমিদারি পুশিলালের বংশধরদের কুক্ষিগত হল। কালীনারায়ণ ইংরেজ-অনুগৃহীত ছিলেন। পূর্ববঙ্গে ইংরেজ-আনুগত্যের জন্য কালীনারায়ণই সর্বপ্রথমে 'রাজবাহাদুর' উপাধি পেয়েছেন।[৯]

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের রায়ত-কৃষক ভূমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত হয়ে নয়া ভূস্বামীশ্রেণীর শোষণের শিকারে পরিণত হয়েছেন; ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'মগের মুলুক' পুস্তকাকারে প্রকাশ করে ভাওয়ালের স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস সামন্ত-গোষ্ঠীর হিংস্র আক্রমণে জন্মভূমিতে বসবাসের অধিকার হারিয়েছেন। এই সুদীর্ঘ একশত বছরে বাংলার প্রত্যেকটি জেলার মাটি কৃষক-প্রজাদের রক্তে সিক্ত হয়েছে; নদী-নালা, খাল-বিলে তাঁদের প্রাণহীন দেহ ভেসে উঠেছে; আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁদের বুক-ফাটা আর্তনাদ। তাঁদের প্রতিরোধ-বিদ্রোহকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সামন্তশ্রেণীর সাহায্যে এগিয়ে এসেছে বৃটিশ-সরকার। কিন্তু সহায়-সম্বলহীন কৃষক-প্রজাদের ব্যথা-বেদনাকে রূপ দেবার জন্য উনিশ শতকে যে-অল্প কয়েকজন ভূমিস্বার্থ-সম্পর্ক বিরহিত

বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিক আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দাস।

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা-পরগণার মত ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়ালের রায়ত-প্রজারাও রাজা-ম্যানেজারের অত্যাচার উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করেছেন, নীরক্ত দেহে মৃত্যুর দিন গুনেছেন। তাঁদের সমর্থনে লেখনী-ধারণের মানসিকতা সেকালের খ্যাতনামা লেখকদের ছিল না। ঢাকা অঞ্চলের তৎকালীন ভূমি-নির্ভর বিদ্বৎসমাজ নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেও দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ভাওয়ালের রাজা ও ম্যানেজারের প্রজা-পীড়নের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করেননি; এমন কি প্রতিবাদও না। ভূমি-স্বার্থে তাঁরা যখন নিজেদের বিবেককে সামন্ত-প্রভুদের কাছে বন্ধক দিয়েছেন, তখন অল্প-শিক্ষিত ও ইংরাজী-শিক্ষায় বঞ্চিত স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ভবিষ্যৎ সুখ-সমৃদ্ধির প্রলোভনকে অস্বীকার করে কৃষক-প্রজাদের সমর্থনে এগিয়ে এসে দুঃসহ দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছেন। কিন্তু এই দারিদ্র্য-বরণ করার পশ্চাতে ছিল রায়ত সমাজের প্রতি কবির আত্যন্তিক সহানুভূতি ও ভূস্বামী-বিরোধী তীব্র মনোভাব।

গোবিন্দ দাসের আবির্ভাব কালে ভূম্যধিকারী শ্রেণীর দাপট ছিল অব্যাহত। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি সামন্ত-প্রভুদের দমন-পীড়নে সাহায্য করেছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ আইন কিংবা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আইন প্রজাদের সামন্ত-শোষণ থেকে রক্ষা করতে পারেনি এবং তাঁদের আর্থিক অবস্থারও কোনো উন্নতি ঘটেনি। সমকালীন ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে জানা যায়, "দরিদ্র অজ্ঞান কৃষকগণের প্রতি উৎপীড়ন করিতে পারিলে কেহই ছাড়েন না। প্রথম উৎপীড়ক জমীদার। প্রজাদিগের নিকট কর আদায় করিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্ট জমীদারদিগকে প্রদান করিয়াছেন; এই ক্ষমতা দ্বারা জমীদারেরা পল্লীগ্রামের সমস্ত আধিপত্য করিয়া থাকেন। একপ্রকার তাঁহাদিগকে পল্লীগ্রামের জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর বলিলেও বলা যায়।"[১০]

নয়া ভূস্বামীশ্রেণী সম্পর্কে ইতিহাস নিষ্করুণ, নির্মোহ। ইতিহাস বলে, "এখন যেখানেই প্রাচীন ভূস্বামীবংশের স্থানে সদ্যজাত জমীদার উত্থিত হইয়াছে, প্রায় সেখানেই অত্যাচার। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক আয়র্লণ্ডের জমীদারগণের ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিয়া প্রজাপীড়ন পূর্ব্বক

জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করেন।···তাঁহাদিগের আয় বৃদ্ধি করার উপায় জমা বৃদ্ধি করা এবং যে প্রজা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করে, তাহাকে উচ্ছেদ করা।"[১১]

উনিশ শতকের ভূমি-সংশ্লিষ্ট সারস্বত-সমাজ ভূম্যধিকারী শ্রেণীর অত্যাচার উৎপীড়ন সম্পর্কে নীরব থাকলেও ইতিহাস নীরব নয়, মুখর। ইতিহাসকে সাক্ষ্য মানলে জানা যায়, "পূর্ব্বে এই বঙ্গে জমীদার প্রজায় কি মধুর সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানি না, কিন্তু গত বিশ বর্ষে বঙ্গের বহু গ্রামের যে চিত্র দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে বলিতে সঙ্কোচ বা ভয় হয় না যে জমীদার এবং প্রজায় এখন যেন খাদ্য খাদক সম্বন্ধ।"[১২] জমিদারের 'খাদ্য'-রূপে যাঁরা জীবনাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে তৎকালে লেখা হয়েছে, "যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদিগের মধ্যে লাখ লাখ লোক আধপেটা খাইয়া আধমরা হইয়া আছে! গরীব কৃষকের ত কথাই নাই। দু বেলা অন্ন তাহাদের ত কখন জুটে না, চোখের জল তাহাদিগের কখন শুকায় না, পেটের জ্বালায় তাহারা নিয়ত জ্বলিতেছে।···মহাজনের দেনা ও জমিদারের খাজনা না দিতে পারিলে চাষার গায়ের মাংস লইয়া টানাটানি হয়। মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া, শস্য উৎপাদন করিল কৃষক। শস্য বা তাহার মূল্য উঠিল মহাজন জমিদারের ঘরে।"[১৩]

এ সময়ে পূর্ব বাংলা যখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত, তখন জমিদারেরা প্রজাদের কাছ থেকে নির্মমভাবে খাজনা আদায় করেছেন; দয়া-মায়া, কারুণ্যের কোনো পরিচয় তাঁদের আচরণে দেখা দেয়নি। তৎকালীন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠা ওল্টালেই দেখা যায়, "এই দুঃখ দুর্দ্দিনেও জমীদারেরাও কোমর বাঁধিয়া খাজনা আদায় করিতেছেন—এ বিবরণ অনেক জ্ঞাত হইতেছি। প্রজার অসংখ্য পিতামাতা আজ রাক্ষসের করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন,—রক্ত শোষণ করিয়া, কত প্রজার ভিটা, মাটী, ঘটী, বাটী বিক্রয় করাইয়াও খাজানা আদায় করিতেছেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনই হউন বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই হউন, কাহার কথা বলিতে চাও? যাহা প্রত্যক্ষ ঘটিতেছে, অনুসন্ধান করিয়া এস, বুঝিতে পারিবে, তাহা মর্ম্মপীড়ক, তাহা দুঃখদায়ক, তাহা হৃদয়বিদায়ক। কিন্তু সে সকল কথা বলে কে? এ দেশের পত্রিকা সকল দিন দিন যেন ধনীদিগের পোষ্যপুত্র স্বরূপ হইতেছেন। তাঁহাদের অত্যাচার, অমানুষী পশুতুল্য ব্যবহার, তাঁহাদের জীবন-সুলভ অকীর্ত্তিরাশি ঘোষণা করিতে কোন পত্রিকা নাই।"[১৪]

এই পটভূমিতে স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই

জানুয়ারী (৪ঠা মাঘ, ১২৬১ বঙ্গাব্দ) তারিখে ভাওয়ালের জয়দেবপুরে এক অতি দরিদ্র-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত মহেশ্বরদী পরগণার অধীনস্থ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল কবির পূর্বপুরুষদের বাসভূমি। তাঁর পিতামহ ভোলানাথ দাস ঋণের জ্বালায় জন্মভূমি ত্যাগ করে অরণ্য-সমাকীর্ণ ভাওয়ালের জয়দেবপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। গোবিন্দচন্দ্র শৈশবেই দেখেছেন দারিদ্র্যের উলঙ্গ রূপ। তাঁর পাঁচ বৎসর বয়সকালে পিতা রামনাথ দাসের মৃত্যু হওয়ায় সমগ্র পরিবার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে তাঁরা অনশন-অর্ধাশনের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার আপ্রাণ প্রয়াস করেছেন। এ সময়ে শিক্ষার্জন কবির কাছে স্বপ্ন মাত্র; তবুও তিনি লেখা পড়া শিখতে চেষ্টা করেছেন। কবি-গৃহের সন্নিকটে তাঁর পিতার জ্ঞাতি সম্পর্কে এক অপুত্রক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাসস্থান ছিল। গোবিন্দ দাস অনেক সময়ে জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়িতে থাকতেন এবং তাঁর শ্যালক নন্দরাম ঘোষের কাছে বর্ণপরিচয়ের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "নন্দরাম ঘোষের নিকট আমি লিখিতাম, আর জ্যেঠা মহাশয়ের গরুর চাকর (রাখাল) 'দাগা' চাড়ালের সঙ্গে গিয়া গরু রাখিতাম।"[১৫] সমাজের অন্ত্যজশ্রেণীর দরিদ্র শিশুরা ছিল কবির শৈশব ও কৈশোর-জীবনের ক্রীড়া-সঙ্গী। অবশ্য রাজানুগ্রহে রাজগৃহে কবির যাতায়াত ছিল এবং রাজপরিবারের বিলাস-বৈভবময় জীবনযাত্রার সঙ্গে কবি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। ফলে সমাজের ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর জীবন যাত্রার নিদারুণ পার্থক্য কবিচিত্তে গভীর রেখাপাত করেছে। অবাক বিস্ময়ে তিনি আপন মনে প্রশ্ন করেছেন, কেন ভূস্বামী-শ্রেণীর অকারণ নির্মমতা ও অপরিমেয় বিলাসিতা এবং কেনই বা রায়তশ্রেণীর দারিদ্র্যপীড়িত অন্ধকারময় জীবন? কেনই বা লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা তাঁদের শিরোভূষণ? কবি সারাজীবন এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন, একাকী বিদ্রোহ করেছেন এবং ধনলোভে আত্মসমর্পণ না করে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাওয়ালে 'বান্ধব' সম্পাদক ও গোবিন্দ দাস

রায়ত প্রসঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র দাসের ভূমিকাকে উপলব্ধি করতে হলে ভাওয়াল রাজ্যের ম্যানেজার কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পর্কে কিছু আলোকপাতের প্রয়োজন। ভূস্বামী-বংশে কালীপ্রসন্নের জন্ম (২৩শে জুলাই, ১৮৪৩ খ্রীঃ। ৮ই শ্রাবণ, ১২৫০ বঙ্গাব্দ)। পিতা শিবনাথ ঘোষ ছিলেন বরিশালের পুলিশের দারোগা। তাঁর 'প্রপিতামহ ঠাকুর রামপ্রসাদ ঘোষ ঢাকার নবাব-সরকারে বড় কাজ করিয়া বিক্রমপুরের অঙ্গীভূত দোহার পরগণায় ভাল জমিদারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং কাঁটালিয়া গ্রামে বাড়ী ঘর বানাইয়া[1] ছিলেন। কিন্তু 'রামপ্রসাদের কাঁটালিয়ার বাড়ী ও জমিদারীর প্রধান ভাগ কীর্তিনাশার উদরস্থ হওয়ায় তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ উত্তরে প্রায় দুই প্রহরের পথ সরিয়া ভরাকর গ্রামে আসিয়া নূতন বাড়ী করেন। এই স্থানই কালীপ্রসন্নর জন্মস্থান।'[2] ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের আলোকে, শিক্ষিত হলেও ভূমি-নির্ভরতার জন্য কালীপ্রসন্নের চিন্তায় উদারনৈতিক মতবাদ ও কর্মে ভূস্বামী-স্বার্থরক্ষা এবং সামন্ত আচার-আচরণের প্রকাশ ঘটেছে। সেকারণেই তিনি ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কন্যাদের নিষ্ঠাবান কুলীন পরিবারে বিবাহ দিয়েছেন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন ঘোষ ঢাকার ছোট আদালতের 'ক্লার্ক অব্ দি কোর্ট' অর্থাৎ রেজিস্ট্রার পদে নিযুক্ত হয়ে ঢাকা শহরের ভূম্যধিকারী ও শ্বেতাঙ্গ-সমাজে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি সাহিত্য-বিষয়ক 'বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশ করেছেন (জুন, ১৮৭৪ খ্রীঃ। আষাঢ়, ১২৮১ বঙ্গাব্দ) এবং সাহিত্যসমালোচক ও বাগ্মী-রূপে তিনি তৎকালীন খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে নিবিড় সৌহার্দ্য-সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এ সময়ে অন্যান্য ভূস্বামী-বংশের ন্যায় ভাওয়ালের রাজবংশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তিনি নাবালক রাজকুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। রাজেন্দ্রনারায়ণের পিতা রাজা কালীনারায়ণ রায় জমিদারি-কার্যের উপযুক্ত বিবেচনা করে কালীপ্রসন্নকে ভাওয়ালের সর্বপ্রধান রাজকর্মচারী চীফ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বা ম্যানেজারের পদে ২৫০ টাকা

বেতনে নিয়োগ করেন (২৮শে মার্চ, ১৮৭৭ খ্রীঃ। ১৬ই চৈত্র, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ) এবং চক্ষুরোগের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসার (১২৮৪ বঙ্গাব্দ) কিছু-কাল পরে কালীনারায়ণের অকস্মাৎ মৃত্যু হয় (৩রা আষাঢ়, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ)।

৩১ বৎসর বয়সে ভাওয়াল পরগণার সর্বপ্রধান রাজকর্মচারীরূপে জয়দেবপুরে এসে কালীপ্রসন্ন ঘোষ আপন ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের দ্বারা স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত হন। তিনি পুরাতন কর্মচারীদের বিতাড়িত করে স্বার্থসিদ্ধির উপযুক্ত আত্মীয়-বন্ধুদের জমিদারির কাজে নিয়োগ করেছেন। গোবিন্দচন্দ্র 'মগের মুলুক' কাব্যে লিখেছেন,

" ছিল যারা হিতকারী প্রাচীন কর্ম্মচারী,
অঙ্গারকের ষড়যন্ত্রে তারা গেল হারি।

*   *

অঙ্গারকের শালার শালা তস্য শালা যারা,
রাজার বাড়ীর কর্মচারী এখন সবে তারা!"

(—মগের মুলুক। পংক্তি: ২৩৩-৩৪, ২৪৯-৫০)

রাজা কালীনারায়ণের আকস্মিক মৃত্যু কালীপ্রসন্নকে রাজ্যের কৃষক-প্রজাদের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা-রূপে প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছিল। রাজকুমার অপ্রাপ্তবয়স্ক হলেও মদ্যপ, লম্পট ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। তাঁর ব্যভিচারী জীবনের প্রধান প্রশ্রয়দাতা ছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ। পরবর্তীকালে (১৩০৮) বিধবা রানী বিলাসমণি কালীপ্রসন্নের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে গিয়ে বলেছেন, "স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয়ের জীবনকালেই বিবাদী ক্রমে বাদিনীর যুবক স্বামী মহাশয়ের সুকুমার চিত্তের উপর আধিপত্য অর্জ্জন করিতে থাকেন এবং অবশেষে স্বামী মহাশয়কে এরূপভাবে সম্পূর্ণরূপে নিজ আয়ত্বাধীনে আনেন যে তিনি বিবাদীর সম্পূর্ণ অনুগত ও তাঁহার ইচ্ছার বশীভূত হইয়া পড়েন এবং বিবাদী স্বামী মহাশয়কে সুশিক্ষা দেওয়া ও কার্য্যে নিবিষ্ট করার পরিবর্ত্তে শ্বশুর মহাশয়ের অজ্ঞাতে বাদিনীর স্বামীকে কুঅভ্যাস ও মন্দ কার্য্যে আশক্তি জন্মাইয়াছিলেন।"[৩]

কালীনারায়ণের মৃত্যুর পরে রাজেন্দ্রনারায়ণ জমিদারি-পরিচালনার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ না করে কালীপ্রসন্নের পরামর্শে তাঁকে রাজ্য-সংক্রান্ত সম্পূর্ণ ক্ষমতা দান করে নিজে বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। উপরোক্ত অভিযোগ-লিপিতে রানী বিলাসমণি বলেছেন, "বাদিনীর স্বামী…

শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই···বিবাদীর অনুকূলে এক আমমোক্তার-নামা সম্পাদন করিয়া দেন, এবং···বিবাদীকে কর্ম্মচারীগণের নিকাশ গ্রহণ, খরচ বহাল বাজেয়াপ্ত ও হুজুরী মফস্বলী, সমস্ত কর্মচারী বহাল ও বরতরফ করার ক্ষমতা ও অন্যান্য ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন। এবং বিবাদী ক্রমে শাসন সমরক্ষণের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার এবং ষ্টেটের আয় ব্যয় ও তহবিলের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। এই প্রকারে স্বামী মহাশয় ক্রমে বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কিত কার্য্য ও ষ্টেটের আয় ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা একেবারে পরিত্যাগ করেন এবং বিবাদীর প্রতি অচল বিশ্বাস স্থাপন করেন। এবং বাদিনীর স্বামী অসার দোষনীয় আমোদ প্রমোদে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট এবং···পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত থাকেন, এবং তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, পূর্ব্বে তিনি যে খাজাঞ্চিখানার সুমার দস্তখত করিতেন তাহা হইতে···ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।"[৪]

এ সম্পর্কে গোবিন্দ দাস লিখেছেন,

"নষ্ট দুষ্ট ধূর্ত্ত ক্রুর রাজার ম্যানেজার,
সোনার লঙ্কা স্বর্গপুরী কল্লে ছারখার!
নাইক তাহার পাপ পুণ্য দয়া ধর্ম জ্ঞান,
পুরাণ পাপী ব্রহ্মদৈত্যি বেজাত কেরেস্তান!
মদ মুর্গি নিত্যি চলে পঞ্চ ম-কার সব,
দেখলে পরে পাঠা ছাড়া হয় না অনুভব!
নিরেট বোকা গর্দ্দভেন্দ্র বুঝতে নাহি পারে,
আচ্ছা করে মদ খাইয়ে বশ করিলে তারে!
ইয়ার দিল বেছে বেছে আপনা মানুষ জন,
এনে দিল মদের পিপা লাগুক যত মণ!
বেশ্যা দিল যুবকি দিল আমর গেল যুটে,
আপনি এখন স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটে পুটে!

* * *

বোকাচন্দ্র গর্দ্দভেন্দ্র বুঝায় তারে যবে,
আপনি যদি কার্য্য করবেন আমরা কেন তবে?
লম্বা লম্বা মাইনে পাব বসে খাব ছি!
আপনি করবেন পরিশ্রম ত লোকে বলবে কি?
এত বৈভব এত দৌলত, পেয়ে এত ধন,
খেটে মরলে এ সব দিয়ে কোন্ বা প্রয়োজন?

মজা করুন দিবানিশি লাগুক উপভোগে,
কেন বৃথা ভেবে মর্কেন মিথ্যা গোলযোগে !
সুখের সময় যাচ্ছে বয়ে এইত সুখের দিন,
কলির মানুষ কদিন বাঁচে মজা করে নিন্ !
বোকাচন্দ্র ধোকা খেয়ে পড়ে গেছেন ফাঁদে,
আটকে গেছে ব্যভিচার আর বিলাসিতার বাধে !
তাইতে করেন বদমায়েসী নানান্ দেশে ছুটে,
এদিকে তারা স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটে পুটে !"

(—মগের মুলুক। পংক্তি : ২০৩-১৪, ২১৯-৩২)

কালীনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পূর্বে রাজপরিবারের সঙ্গে সৌহার্দ্য-সূত্রে গোবিন্দচন্দ্র দাস কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন (১২৮৪ বঙ্গাব্দ) ; তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। প্রাইভেট সেক্রেটারী রূপে তিনি দিনের পর দিন ভাওয়াল-ভূস্বামীর প্রজা-পীড়ন লক্ষ্য করেছেন, শুনেছেন অসহায় রায়তের আর্ত কান্না। ফলে কিছুকালের মধ্যেই ৩১বৎসর বয়স্ক ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন ও কূটকৌশলী ম্যানেজারের সঙ্গে বিবেকসম্পন্ন ও আবেগপ্রবণ ২৩ বৎসর বয়স্ক অনভিজ্ঞ স্বভাবকবির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুরু হল— সূত্রপাত ঘটল প্রজার বৌ-ঝিদের মান-ইজ্জত রক্ষার প্রশ্নে।

রাজকার্য-পরিচালনায় রাজেন্দ্রনারায়ণের ঔদাসীন্য ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের উপরে একান্ত নির্ভরশীলতা রায়ত-প্রজাদের পক্ষে সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠেছিল। রাজকর্মচারীদের নিষ্ঠুর-নির্মম অত্যাচার ও দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা সমগ্র ভাওয়াল রাজ্যকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করেছিল। ম্যানেজারের বাধাদানে কৃষকের কান্না রাজদরবারে পৌছুত না, তা রাজপ্রাসাদের বাইরের আকাশ-বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। কিন্তু স্থির থাকতে পারলেন না স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র। ভয়াবহ সামন্ত-শোষণ ও রিক্ত-নিঃস্ব রায়ত-কৃষকের অসহায় আত্মসমর্পণ তাঁকে বিচলিত করেছে ; রাজ-যন্ত্রের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াতে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। যখন ভূমি-নির্ভর বিদ্বৎসমাজ ভূমি-স্বার্থে রায়ত-প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার প্রতি উদাসীন, তখন নিজের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে বিপদাপন্ন করে তিনি বারবার রাজকর্মচারীদের অত্যাচারের প্রতি রাজেন্দ্রনারায়ণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। ফলে তিনি শোষক-গোষ্ঠীর বিষ-নজরে পড়েছেন। ম্যানেজার কালীপ্রসন্ন কবির প্রজা-প্রীতিকে

নিজের বিপদ বলে গণ্য করেছেন এবং স্বীয় গোষ্ঠীর আধিপত্য-প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য কবির এবম্বিধ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। গোবিন্দ দাস এক চিঠিতে লিখেছেন, "নিজের কাজ নিজেই করা কর্ত্তব্য, অন্ততঃ সর্ব্বোপরি সময় সময় তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন একান্ত আবশ্যক। সহস্র সহস্র লোকের সুখ, দুঃখ ও ন্যায় অন্যায়ের বিচার ভার বিধাতা যাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কত বড় দায়িত্ব একথা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতাম। কাহারও প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে, বিষয় সম্পত্তির ভারার্পণ করা যে বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, ইহাও তাঁহাকে সর্ব্বদা বলিতাম। ক্রমে একথা কালীপ্রসন্নের কানে গিয়া পৌছিল। আমাকে কিরূপে রাজার নিকট হইতে তাড়াইয়া, তাঁহার অনুগত ও বাধ্যলোক রাজার নিকটে আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, এখন তাঁহার সেই চেষ্টা হইল। কিন্তু আমার কোন ত্রুটি না পাইলেও অন্য কারণে তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইল।"[৫]

রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী গোবিন্দ দাস। শোষক-গোষ্ঠীর অনুগামী হয়ে সামান্য অঙ্গুলি হেলন করলেই ধন-দৌলত কবির ঘরে এসে উপস্থিত হত; জমিদার-তালুকদার-রূপে তিনি ধনীসমাজে আধিপত্য বিস্তার করতে পারতেন, ধনীর প্রসাদ-ভিক্ষু সাহিত্যিক-সমাজে তিনি প্রথম সারির আসন লাভ করতেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁকে কোনো দুশ্চিন্তাও করতে হত না। কিন্তু অর্থলোভে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে কবি একান্তভাবেই নারাজ। তিনি লিখেছেন,

"শক্তির স্বেচ্ছাচার, দেশজুড়ে অত্যাচার
যারে ধরে একেবারে দেয় গুড়া করে!
তোষামোদ ঘৃণা করি, হুজুরের মোহর-কড়ি
মানুষেরে কিনে নিয়ে অমানুষ করে॥
বিবেকের কথাগুলি, দিতে হয় জলাঞ্জলি
ক্ষমতার পায়ে যবে নিজেরে বিকায়।
পারিব না ছোটো হ'তে না থাকিলাম দুধে-ভাতে
পারিব না সম্মানেরে ভুলিতে শিকায়॥[৬]

শৈশবের অপরিমেয় দারিদ্র্য ও বন্ধনহীন মুক্ত জীবন গোবিন্দ দাসকে আপোসহীন ও অনমনীয় বিদ্রোহী-রূপে গড়ে তুলেছিল। ভয়াবহ সামন্ত-শোষণ বিবেকবান কবিকে বিচলিত করেছে। তাই ভবিষ্যৎ সুখ-সমৃদ্ধির দিকে

না তাকিয়ে তিনি অশক্ত-অক্ষম দুর্বল প্রজাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন, আত্ম-বিক্রি না করে রাজ-অত্যাচার থেকে তাঁদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের ব্যথা-বেদনাকে রূপ দেবার জন্য কবি তাঁর সহজাত প্রতিভাকে নিয়োগ করেছেন; সামন্ত-প্রভুদের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে তিনি অশঙ্কিত চিত্তে বারবার নিজের বিপদ ডেকে এনেছেন। তাসত্ত্বেও তিনি বিপদাপন্ন কৃষক-রায়তের পক্ষ ত্যাগ করেননি; তাদের সঙ্গে থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন, কৃষক চাষ করেন, তাঁতি তাঁত বুনেন, অথচ তার ফলভোগ করেন প্রজাপীড়ক জমিদার ও তাঁর অনুচরবৃন্দ। কবি তাই ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছেন,

"কাহার তরে চাষ কর ভাই
কাহার তরে চাষ?
যে জমিদার সর্ব্বনাশা
তাহার তরে চাষ?
তাঁত বুনেছিস কাহার জন্য?
কাড়ছে যেজন গ্রাসের অন্ন?
ফরাসডাঙ্গা ঢাকাই পরে'
যারা তোমায় ফকির করে,
তাদের জন্য কাপড় বুনিস্
আমার তাঁতি ভাই!"[৭]

কবির দৃষ্টিতে ভূস্বামীশ্রেণী রায়ত-জীবনে 'সর্ব্বনাশা'-রূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রেণীগতভাবে তাঁরা ছিলেন রায়ত-পীড়ক ও পরস্বাপহারক। তৎকালীন ইতিহাসও কবির বক্তব্যকেই সমর্থন করে। কিন্তু ভূম্যধিকারী সমাজের আস্থাভাজন ভাওয়াল রাজ্যের ম্যানেজার কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব' পত্রিকায় ভূস্বামীশ্রেণীর 'প্রজাবাৎসল্য' ও 'দয়া দাক্ষিণ্যের' মাহাত্ম্য উচ্চ কণ্ঠে কীর্তন করে লেখা হয়েছে, "জমিদারের কোঁচা ভূলুণ্ঠিত ও সুকুঞ্চিত, তাঁহার ঘর বাড়ীরই বা কত শোভা, তাঁহার সদাব্রত, অতিথিসেবা ও দুর্গাপূজাতে সমারোহই বা কত, তাঁহার হৃদয়ে প্রজাবাৎসল্যই বা কত, পরিবারস্থ সকলের প্রতি তাঁহার যত্নই বা কি প্রগাঢ়, তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যেরও সীমা নেই।" তারপরে লেখক পাদটীকায় লিখেছেন, "বর্ত্তমান জমিদারেরা অনেকে প্রজাপীড়ক বলিয়া রাষ্ট্র। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই প্রজাবৎসল, অন্তত প্রজাপীড়ক জমিদারের সংখ্যা আমাদের দেশে বোধহয় অল্প।"[৮]

'বান্ধব' পত্রিকার নির্জলা ভূস্বামী-তোষণ ফলপ্রসূ হয়েছে। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রধান সামাজিক স্তম্ভ ভূম্যধিকারী শ্রেণীর প্রশংসা-কীর্তনে কালীপ্রসন্নের প্রতি বিদেশী শ্বেতাঙ্গ-শক্তি ও দেশীয় সামন্ত-শ্রেণী খুশি হয়েছেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব উপলক্ষে ইংরেজ-সরকার বিশ্বস্ত সেবক কালীপ্রসন্নকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রদানের দ্বারা পুরস্কৃত করেছেন। এই সম্মান-লাভের জন্য ভাওয়ালের তালুকদারেরা রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সভাপতিত্বে এক সম্বর্ধনা-সভায় তাঁকে অভিনন্দন-পত্র ও বহুমূল্য সোনার ঘড়ি উপহার দিয়েছেন।[৯]

তৃতীয় অধ্যায়
প্রজা-স্বার্থে সংঘর্ষ ও পদত্যাগ

প্রজাদের মান-ইজ্জত রক্ষায় ক্রমেই লৌহ-কঠিন হয়ে উঠেছেন গোবিন্দ দাস। ভাওয়াল-ভূস্বামীর কিংবা তাঁর আত্মীয় পার্ষদদের ইন্দ্রিয়-লালসার তৃপ্তি-সাধনের জন্য লেঠেল বাহিনীর আক্রমণে কার ঘরের লক্ষ্মী অপহৃতা হয়ে আত্মাহুতি দেবে—সে আশঙ্কায় কৃষক প্রজারা দুঃস্বপ্নের নিশিযাপন করছেন। এমন সময়ে এক গভীর রাত্রে ভাওয়ালের প্রজা বেচু শিকদারের স্ত্রীর উপরে বলাৎকারের অভিপ্রায়ে রাজার দুই আত্মীয় মফস্বল ডিহি কাছারির নায়েব শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়) ও সদরের নাজির শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট) ব্যাঙ্গা খানসামাকে সঙ্গে নিয়ে মত্ত অবস্থায় বেচুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং প্রচণ্ড জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে। তখন বাড়িতে একমাত্র ভৃত্য ছাড়া আর কোনো পুরুষ অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন না। কর্মব্যপদেশে বেচুও সে রাত্রে গৃহে অনুপস্থিত। এই অবস্থায় প্রাণ-মান বাঁচানোর জন্য বেচুর স্ত্রী চীৎকার করে গ্রামবাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকেন এবং তাঁর ভৃত্য হামলাকারীদের বাধা দিতে গিয়ে গুরুতর আহত হন। বেচুর স্ত্রীর চীৎকারে গ্রামবাসীদের ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে দেখে তারা পলায়ন করে। বেচু শিকদার বাড়িতে এসে আনুপূর্বিক বিবরণ শুনে ন্যায় বিচারের আশায় রাজ দরবারে রাজার আত্মীয়-কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন। কিন্তু 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। ম্যানেজার কালীপ্রসন্ন ঘোষের অভিনব বিচারে রাজার আত্মীয়রা নির্দোষ সাব্যস্ত হলেন, কেবলমাত্র ব্যাঙ্গা খানসামার পাঁচ টাকার অর্থদণ্ড হল।

এভাবে দোষী ব্যক্তিরা বেকসুর খালাস পাওয়ায় ভাওয়ালের রায়ত-প্রজারা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বেচু শিকদারের কাতর ক্রন্দনে বিচলিত হয়েছেন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পল্লীকবি গোবিন্দ দাস। বেচুর অপমানকে তিনি নিজের অপমান বলে গণ্য করেছেন। সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি রাজেন্দ্রনারায়ণের কাছে অপরাধীদের পুনর্বিচারের দাবি উত্থাপন করেছেন। তার পরের ঘটনা কবির মুখেই শোনা যাক—"যথা সময়ে আমি চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। রাজাকে

আমি অনেক বলিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুই ফল হইল না। তখন রাজাকে বাধ্য করিয়া বিচার করাইবার জন্য আমার জিদ্ হইল। আমি জয়দেবপুরের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, নাপিত, চণ্ডাল প্রভৃতি সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলাম, আজ বেচুর বাড়ী যে ঘটনা হইয়াছে, অপরাধীরা যদি তাহার জন্য উপযুক্ত রূপে দণ্ডিত না হয়, তবে কাল তোমাদের বাড়ীতে যে সেই কাণ্ড করিবে না তাহার বিশ্বাস কি? ভবিষ্যতে নিজের মান ইজ্জত রক্ষার জন্য বেচুর বাড়ীর এই ঘটনার উপযুক্ত প্রতিকার করার জন্য সকলেরই প্রাণপণে যত্ন-চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সভা সমিতি করিয়া জয়দেবপুরবাসী সকলকে একথা বুঝাইয়া এক দলভুক্ত করিলাম এবং সকলকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলাম যে রাজা যদি পুনরায় ইহার ন্যায়বিচার না করেন, তবে আমরা নিজে ইহার বিচার-ভার গ্রহণ করিয়া ব্যাঙ্গা ও শ্যামাচরণদ্বয়কে উপযুক্ত শাস্তি দিব এবং ভবিষ্যতে আর কোন ভাওয়ালবাসী প্রজা যেন রাজবাড়ী বিচারপ্রার্থী না হয়, তাহার জন্যও বিহিত উপায় অবলম্বন করিব।"[১]

কবি গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন জনজীবনের শরিক, তাদের দুঃখ-বেদনা আপন হৃদয়ের অন্তস্থলে অনুভব করতেন। তাই রাজ সরকারে চাকরি করলেও তিনি মাটির সন্তানদের ভুলতে পারেননি। রাজ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে তিনি কৃষক প্রজাদের অনুপ্রাণিত করেছেন এবং তাঁদেরকে নিয়ে রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করেছেন। কবির নেতৃত্বে সুসংহত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রজাসাধারণকে দেখে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এবং দোষী ব্যক্তিদের পুনর্বিচার করে শ্যামাচরণদ্বয়কে কর্মচ্যুত ও ব্যাঙ্গাকে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

কিন্তু বেচু শিকদারের অপমান কবি-হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। তিনি দেখেছেন, ভাওয়াল রাজা স্বীয় স্বার্থে-ই আত্মীয়-অনুচরদের অত্যাচার বন্ধ করার কোনো চেষ্টা করবেন না; বরং তাদের সমস্ত রকম দমন-পীড়নে প্রশ্রয় দেবেন। তাঁর দৃষ্টিতে কালীপ্রসন্ন ছিলেন এই সকল বিষয়ে রাজার প্রধান পরামর্শদাতা। কিন্তু মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ গোবিন্দ দাস। সামন্ত গোষ্ঠীর শোষণ-লুণ্ঠন থেকে কৃষক-রায়তকে রক্ষা রক্ষা করার জন্য তিনি আর এই সামন্ত-যন্ত্রের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাইলেন না। সেই মুহূর্তে বিচার-সভায় উপস্থিত প্রজাসাধারণের সম্মুখে কবি তীব্র ঘৃণার সঙ্গে রাজ-সরকারের

চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে কঠোর দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছেন ; আরামপ্রদ জীবন ও নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ তাঁকে মুহূর্তের জন্যেও দ্বিধাগ্রস্ত করেনি! কবির কথায়, "সেই মুহূর্ত্তে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে রাজার চাকরি ইস্তাফা দিলাম। ...আমার জিম্মায় রাজার যে সকল কাগজ-টাকা-কড়ি, নোট ইত্যাদি ছিল, তাহা ঐ প্রকাশ্য সভায় বুঝাইয়া দিয়া রাজার নিকট বাক্সের চাবি দিলাম। এই হইতে জয়দেবপুরের চাকরি আমার ক্ষান্ত হইল। ...প্রকারান্তরে কালীপ্রসন্ন ঘোষের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সে তাহার অনুগত লোক, রাজার নিকট আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিল।"[২]

১২৮৪ বঙ্গাব্দে এক বৎসর চাকুরিকাল পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কৃষক-প্রজাদের স্বার্থে স্বভাবকবি ভাওয়ালের রাজবাড়ির সুখৈশ্বর্য হেলাভরে পরিত্যাগ করে যে নির্ভীকতা ও উচ্চ নৈতিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা উনিশ শতকে বিরল ছিল। সচ্ছল জীবনযাপনে কিছুকাল অভ্যস্ত হলেও গোবিন্দচন্দ্র শোষণ-যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি, প্রজা-স্বার্থের বিনিময়ে উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধিপূর্ণ ভবিষ্যতের মোহময় হাতছানিতে তিনি বিভ্রান্ত হয়নি। শৈশবে যে দারিদ্র্য-পূর্ণ জীবনের মধ্য দিয়ে তিনি যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছেন, স্বেচ্ছায় সেই দারিদ্র্যকেই তিনি যৌবনের জয়টীকা বলে গ্রহণ করেছেন। তারপরে শুরু হয়েছে নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে কবির কঠোর-কঠিন সংগ্রাম। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই সংগ্রাম করেছেন।

শৈশব ও যৌবনের স্মৃতি-বিজড়িত ভাওয়ালের মায়া ত্যাগ করে জীবিকা-র্জনের উদ্দেশে কবি বিদেশে যেতে পারেননি। দু'বছর তিনি দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করেও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভাওয়ালে থেকেছেন। এ সময়ে দিনান্তে এক মুষ্টি অন্নও স্ত্রী-কন্যার মুখে তুলে দিতে তিনি অক্ষম হয়েছেন। দিনের পর দিন স্ত্রী-কন্যা-সহ তিনি অনাহারে-অর্ধাহারে থেকেছেন, তবুও রাজানুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেননি। বেদনামথিত হৃদয়ে কবি লিখেছেন,

"প্রিয়ে দুখিনি আমার।

প্রাণপণে অবিরত, যতন করিনু কত

মুছিতে পারিনু কই শোকাশ্রু তোমার!

শতগ্রন্থি ছিন্নবাস, একাহার উপবাস,

এ জনমে অভাগিনি ঘুচিল না আর!"[৩]

অবশেষে ভাওয়ালে স্ত্রী-কন্যাকে রেখে চাকরের সন্ধানে তিনি বিদেশে যেতে বাধ্য হয়েছেন (১২৮৬ বঙ্গাব্দ)। কিন্তু তিনি ভুলতে পারেননি উৎপীড়িতা

জন্মভূমি ভাওয়ালকে। তখনো ভাওয়াল রাজ্যে সামন্ত-স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বিদ্যমান। দরিদ্র-অসহায় কৃষক-প্রজাসাধারণ কবির স্মৃতিপটে আবির্ভূত হয়। তাই বহুদূর প্রবাসে থেকে গেয়েছেন,

"যাই প্রিয় জন্মভূমি জননি আমার!
ভুলেছ কি গত কথা? আছে কি মা মনে?
সহিয়াছি কত শত প্রেত অত্যাচার
জননি! তোমার তরে অকাতর মনে?
ন্যায়ের পবিত্র বক্ষে করি পদাঘাত
অকালে সেদিন হায় করি চুর চুর,
পিশাচের প্রতিমূর্ত্তি মাগো অকস্মাৎ
ভেঙ্গেছে সে ভাগ্য মোর সোনার মুকুর!
কিন্তু—
এতেও সুখের নাহি ছিল পরিসীমা
মুছিত যদি মা তোর কলঙ্ক কালিমা!
যাই তবে জননি গো বিদায় এখন,
যাই হে স্বদেশবাসি! মনে রে'খ ভাই,
তোমাদেরি তরে সহি এত নির্য্যাতন,
বিড়ম্বিত হইলাম বর্ব্বরের ঠাঁই।"[৪]

বিদেশে গিয়ে গোবিন্দচন্দ্র সুসঙ্গ, মুক্তাগাছা, সেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ভূস্বামীদের অধীনে চাকরি করেছেন। কিন্তু পেষণ-যন্ত্রের কাছে বিবেক-বিক্রিতে সম্মত না হওয়ায় কবি কোথাও বেশিদিন চাকরি করতে পারেন নি। উপার্জিত অর্থের দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব দূরীভূত হয়নি! অতলান্তিক দারিদ্র্যে কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রমদা, স্ত্রী সারদা ও সহোদর জগচ্চন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছে; কিন্তু কবি অনমনীয়। একের পর এক শোকের মর্মান্তিক আঘাত কবিকে বিচলিত করলেও সত্যবোধ-মানবতাবোধ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কবি-চিত্তে "নীরবে নিঃশেষে রক্ত হতেছে পতন", তবুও কবি নতজানু হননি। ভয়াবহ দারিদ্র্য কবি-কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারেনি; অকম্পিত চিত্তে তিনি কাব্য-সাধনা করেছেন। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'প্রেম ও ফুল' (ফাল্গুন, ১২৯৪) এবং 'কুঙ্কুম' (পৌষ, ১২৯৮) কাব্যগ্রন্থ। স্বভাবকবি-রূপে তিনি সমগ্র বাংলাদেশে খ্যাতি লাভ করেছেন। রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের বাইরে থেকে

তিনি তাঁর অনন্যতা ও স্বকীয়তার দ্বারা পাঠকসমাজের প্রশংসা অর্জন করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও পশ্চাদ্বর্ত্তী কবিগণের মধ্যে যে কয়জন কবির গীতিকবিতায় স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় গোবিন্দচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। শুধু তাহাই নহে, এযুগের গীতিকবিদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বোধ করি খাঁটি বাঙ্গালার খাঁটি বাঙ্গালী কবি।'[৫]

তাসত্ত্বেও গোবিন্দ দাস ভাওয়ালের কথা ভুলেননি। প্রশংসা-খ্যাতি তাঁকে দিগ্‌ভ্রান্ত করতে পারেনি। মাঝে-মধ্যে তিনি ভাওয়ালে গিয়েছেন, দরিদ্র প্রজারা তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। রাজেন্দ্রনারায়ণকে তিনি 'কুঙ্কুম' কাব্য উপহার দিয়েছেন। কিন্তু ম্যানেজার কালীপ্রসন্ন ঘোষ অনুচরদের মাধ্যমে তার গতিবিধির উপরে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। রাজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কবির পুনরায় সম্পর্ক-স্থাপন তিনি সুনজরে দেখেননি। সুতরাং কবিকে ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা হল এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র।

চতুর্থ অধ্যায়

কবির চিরনির্বাসন-দণ্ড ও 'মগের মুলুক' রচনা

ফাল্গুন, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ। গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়ালের রাজভবনে গিয়ে শুনেছেন যে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নবযুগ' নামক এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ও ম্যানেজার কালীপ্রসন্নের অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভাষায় রচিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কালীপ্রসন্ন রাজাকে বলেছেন, অনুসন্ধানের দ্বারা তিনি নাকি জানতে পেরেছেন যে, উক্ত প্রবন্ধটি কবির রচনা। অথচ গোবিন্দ দাস এই রচনাটি সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও অবগত ছিলেন না। তিনি ছিলেন নির্ভীক ও তেজস্বী পুরুষ—"সহস্র বিপদ আসিলেও আমি ভয় করি না,—নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যাই। আমি বিপদকে কোন দিনই ভয় করি নাই।"[১] যিনি যত বড় ক্ষমতাধর ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিই হন না কেন, কর্তব্যবোধে তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর সমালোচনা করতে কবি ভীত হতেন না। পশ্চাৎ দিক থেকে কাউকে আক্রমণ করা ছিল তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বেচু শিকদারের ঘটনা কবির বলিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয়বাহী। পক্ষান্তরে, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের পুনর্বিচারের মাধ্যমে কালীপ্রসন্ন ঘোষ যে অবমাননার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার জ্বালা তিনি ভুলতে পারেন নি। কৃষক-প্রজাদের সম্মুখে ম্যানেজারের দম্ভ-অহঙ্কার কবির দ্বারাই ধূলাবলুণ্ঠিত হয়েছিল। গোবিন্দ দাস ছিলেন তাঁদের কাছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। কালীপ্রসন্নের প্রতিহিংসামূলক মনোভাব লক্ষ্য করে কবি লিখেছেন, "শত্রুও ভোলেনি মোরে শত শত্রুতায়, হৃদয়ে জ্বলন্ত স্মৃতি রেখেছে জাগ্রত।"[২] সুতরাং 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটির রচয়িতার পরিচয় সম্পর্কে কালীপ্রসন্নের অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি কি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

কালীপ্রসন্নের অভিপ্রায়-অনুযায়ী রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাসকে চিরনির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করে অবিলম্বে তাঁকে ভাওয়াল পরিত্যাগ করতে আদেশ জারি করেছেন। এখানেই শেষ নয়, কাবকে পথের ভিখারী করার জন্য 'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্নের নির্দেশে কবির পৈতৃক বাস্তুভিটা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিনা দোষে এই নির্মম আঘাত গোবিন্দ

দাসের কাছে অকল্পনীয় ছিল। চিরবাঞ্ছিত জন্মভূমি 'অস্থি মজ্জা'-সম ভাওয়াল থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নেবার সময়ে কবির প্রাণ শতধা বিদীর্ণ হয়েছে, অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করেছেন; তবুও রাজ-দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়নি। অশ্রুসিক্ত নয়নে কপর্দকশূন্য অবস্থায় এক বস্ত্রে কবি ভাওয়াল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তিনি ভুলতে পারেন নি ভাওয়ালকে, ভাওয়ালের রিক্ত-নিঃস্ব প্রজাদের! তাঁদের কথা স্মরণ করে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে কবি লিখেছেন,

"ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!
আহা তার নরনারী, ফেলে যে আঁখির বারি,
অবিচারে ব্যভিচারে হ'য়ে ম্রিয়মান,
বারমাস তের কাত্তি, দিনে রেতে যে ডাকাতি,
বুকে বিঁধে সদা মোর শেলের সমান!
তাদের কলিজা-ভাঙ্গা-যাতনা-আগুন-রাঙ্গা,
শিরায় শিরায় জ্বলে শিখা লেলিহান!
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!"[৩]

কবিকে যখন নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তখন তিনি বাংলার বিদ্বৎসমাজের কাছে অপরিচিত নন। বিভিন্ন সাহিত্য-পত্রে প্রকাশিত তাঁর বহু রস-সার্থক কবিতা তৎকালের প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিকদের প্রশংসা অর্জন করেছে, 'প্রেম ও ফুল'-এর কবি-রূপে পাঠকসমাজে তিনি প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছেন, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (২৫, ২৬ ও ২৭ শে) অনুষ্ঠিত 'জাতীয় মহাসভা' বা 'ন্যাশনাল কনফারেন্স'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে গোবিন্দ দাস যোগদান করেছেন।[৪] তবুও কবিকে ভূস্বামীর রোষাগ্নি থেকে রক্ষা করতে কোনো জাতীয় নেতা কিংবা কোনো খ্যাতনামা সাহিত্যিক অথবা কবি অগ্রসর হননি। স্বভাবকবির সমর্থনে তাঁরা কেউই রাজাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য রাজেন্দ্রনারায়ণকে অনুরোধ করেন নি। ভূমি-স্বার্থ তাঁদের চিন্তাধারাকে পঙ্গু করে রেখেছিল, ভূস্বামী-পৃষ্ঠপোষকতা তাঁদের প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

সুতরাং গোবিন্দচন্দ্র নিজেই কলকাতায় রাজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই দণ্ডাদেশ প্রত্যাহারের চেষ্টা করেছেন। রাজা পুনরায় অনুসন্ধানের

আদেশ জারি করতে অসম্মত হওয়ায় কবি তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলেছেন, "আপনি কি অনুসন্ধান করিবেন? আপনার ক্ষমতা থাকিলে ত? কালীপ্রসন্ন আপনাকে যাহা বলে, তাহাই আপনার বিশ্বাস,—তাহাই আপনার বেদবাক্য।… কালীপ্রসন্ন আপনাকে যাহা বলাইতেছে তাহাই বলিতেছেন। আপনার চক্ষু কর্ণ থাকিলে হৃদয় থাকিলে কালীপ্রসন্ন ভাওয়ালের কি করিয়াছে ও করিতেছে তাহা দেখিতেন ও বুঝিতেন। যা হউক, আমি অপরাধ না করিলেও আপনি আমার যে দণ্ড করিলেন তাহা অতি গুরুতর। ফাঁসির পরই নির্ব্বাসন। আপনি বিনা দোষে আমাকে জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। আচ্ছা, না লিখিলেও যদি লিখিয়াছি বলিয়া মিছামিছি দণ্ডিত হইলাম, তবে এখন হইতে আমি লিখিব। আপনি যতদূর সাধ্য করিবেন।…এখন দেখিবেন আর কেহ লিখিতে পারে কি না।"[৫]

সামন্ত-প্রভু কর্তৃক কবির চিরনির্বাসন-দণ্ড লাভ বাংলা দেশের ইতিহাসে একক দৃষ্টান্ত হলেও তৎকালের সাহিত্যিক-সম্পাদক-সমাজ নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। অথচ গোবিন্দ দাস ভাওয়ালের রাজা ও ম্যানেজারের স্বৈরাচারী অত্যাচারকে প্রতিহত করার জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকদের কাছে গিয়ে ভাওয়ালের ভয়াবহ অবস্থার চিত্র এঁকেছেন এবং অসহায় প্রজাসাধারণ ও নির্বাসিত কবির সপক্ষে লেখনী ধারণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন। কিন্তু কবির নির্বাসন-দণ্ডের কাহিনী তাঁদের বিচলিত করতে পারেনি। সামন্ত-পৃষ্ঠপোষকতা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন 'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের কূটকৌশল তাঁদের প্রতিবাদের কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল। এমন কি নির্বাসন-দণ্ড সম্পর্কিত গোবিন্দচন্দ্রের কোনো রচনাও কালীপ্রসন্নের বিরাগভাজন হবার ভয়ে তাঁরা প্রকাশ করতে রাজী হননি। তাঁদের কাপুরুষতা-ক্লীবতাকে ধিক্কার দিয়ে কবি লিখেছেন,

"যারা বড় মান্য গণ্য,
দেশের উদ্ধার জন্য,
"বঙ্গের উজ্জ্বল" আশা যাহাদেরে কয়;
যত তার অবিচার,
যত তার ব্যভিচার,
যত তার ভয়ঙ্কর কার্য্য পাপময়,

জানিয়া নাহিক জানে,
শুনিয়া শোনেনা কানে,
তাহারি প্রশংসা-গানে করে জয় জয় !
এমন সাহসহীন,
ভীরু কাপুরুষ ক্ষীণ,
বলিতে উচিত কথা সংকুচিত হয়,
পাপেরেও বলে পুণ্য,
হেন মানুষ্যত্ব শূন্য,
এমন করিয়া করে বিবেক বিক্রয় !"[৬]

কালীপ্রসন্ন কর্তৃক সাহিত্যিকদের গ্রন্থ-ক্রয়ের প্রয়াসের মধ্যেই কবির প্রতি বাংলার সারস্বত-সমাজের উদাসীনতা ও নিস্পৃহতার মূল কারণের সন্ধান পাওয়া যাবে। কালীপ্রসন্ন ঘোষ ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রখর চাতুর্যের অধিকারী। সাহিত্যিক সমাজে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তারের জন্য একদিকে 'বান্ধব' পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্য-সমালোচনার নামে প্রশংসার দ্বারা তিনি লেখক-বন্ধু রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন, অন্যদিকে ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের অর্থানুকূল্যে তিনি জয়দেবপুরে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'সাহিত্য-সমালোচনী সভা।' এই সভার পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে :

সাহিত্য-সমালোচনী সভার বিজ্ঞাপন

নিম্নলিখিত মহাশয়গণ জয়দেবপুরস্থ শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সমালোচনী সভার অধ্যক্ষ কমিটির সভ্য হইলেন। এই কমিটির কোন সভ্য কোন বাঙ্গলা গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি কি শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল জ্ঞান করিয়া সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে, সভা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পুস্তকালয়ে কিংবা বিদ্বৎসমাজে বিতরণের জন্য সেই গ্রন্থের বহু খণ্ড ক্রয় করিয়া লইবেন, অথবা অন্য প্রকারে গ্রন্থকারের সাহায্য করিবেন। এইরূপ পুরস্কার বিতরণ কিংবা সাহায্য দানে সম্পাদকের পূর্ব্ববৎ অধিকার থাকিবে এবং সম্পাদকও উল্লিখিত অধ্যক্ষ কমিটির অন্যতম সভ্য বলিয়া রিগণিত হইবেন।

অধ্যক্ষ কমিটির সভ্যদিগের নাম।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ সরকার। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র রায়বাহাদুর C. I. E. শ্রীযুক্ত রেবারেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার। শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ। শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত।

ঢাকা জয়দেবপুর }
২৮ এ ফাল্গুন, ১২৮৮ }

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ
সম্পাদক[৭]

সভা স্থাপনের পশ্চাতে কালীপ্রসন্নের গূঢ় অভিসন্ধি ব্যর্থ হয়নি। "সাহিত্য-সমালোচনী সভা'র দ্বারা কালীপ্রসন্ন বহু সাহিত্যিকের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন।"[৮] এবং তাঁরাও সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। যে-ভূস্বামীর অর্থসাহায্যে কবি-লেখকেরা সমৃদ্ধ হবেন এবং যেখানে 'পুরস্কার বিতরণ কিংবা সাহায্য দানে সম্পাদকের' একচ্ছত্র ক্ষমতা, সেখানে রাজা কিংবা ম্যানেজারের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের সর্বনাশ সাধন করার মতো দ্বিতীয় মূর্খ গোবিন্দ দাসের ন্যায় অন্য কেউই ছিলেন না। তাই তাঁরা কালীপ্রসন্নের ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁর সপক্ষে লেখনী-ধারণ করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী লিখেছেন, "কালীপ্রসন্ন 'বঙ্গবাসী'র সাহায্যে নিজ দুষ্কৃতি ঢাকিতে সচেষ্ট হইলেন।...তিনি গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি যে অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন তাহা পড়িলে পাষাণও ফাটিয়া যায়।"[৯] স্বভাবকবি এ সম্পর্কে লিখেছেন,

"বদের হাঁড়ি চালাক ভারী দুষ্ট ম্যানেজার,
বদনামী ঢাকিতে দেখ ফন্দি কেমন তার!
খোস্‌নামী লেখায়ে বেটা আপনা মানুষ দিয়া,
পত্রিকাতে মিথ্যা কথা দিচ্ছে ছাপাইয়া!
টাকা দিয়া কচ্ছে আবার কারে কারে বশ,
লিখছে তারা অজারক আর গাধার কত যশ!"

(—মগের মুলুক। পংক্তি: ৪৭৫-৪৮০)

এই সকল কারণে পল্লীকবি অভিজাত বিদ্বৎসমাজের কোনো সমর্থন পাননি। কিন্তু তাঁদের প্রত্যাখ্যান কবি-চিত্তে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। সারস্বত-সমাজের সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে কবি একাকী ভাওয়ালের সামন্ত-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছেন এবং মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে 'মগের মুলুক' রচনা করে তিনি ভীমরুলের চাকে আঘাত দিয়েছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

'মগের মুলুক'-এর বিরুদ্ধে মামলা ও কবির প্রাণ-হরণের প্রয়াস

'নব্য ভারত' পত্রিকার সম্পাদক ও কবি-সুহৃদ দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী গোবিন্দ দাসের 'মগের মুলুক' পাঠ করে বুঝেছিলেন যে, এই কাব্য তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তিনি বিপদাপন্ন হবেন। সুতরাং 'নব্যভারত' পত্রিকায় তা প্রকাশ না করে তিনি 'প্রকৃতি' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছেন। 'প্রকৃতি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অনুকূলচন্দ্র মুখার্জী। এই পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের (১২৯৯ বঙ্গাব্দ) ৫ই ভাদ্র, ১৯এ ভাদ্র, ৯ই আশ্বিন, ২৪এ পৌষ, ২রা মাঘ এবং ২৩এ মাঘ সংখ্যায় সমগ্র কাব্যটি ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়।

গোবিন্দচন্দ্র দাস সহজ-সরল ভাষার নির্ভীক পল্লীকবি; শহুরে মার-প্যাঁচ তাঁর কাছে অজ্ঞাত। ভাওয়ালের সামন্ত-গোষ্ঠীর স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য 'মগের মুলুক' রচনা ও স্বনামে প্রকাশের দ্বারা তিনি যে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছেন, তা উনিশ শতকে দুর্লভ ছিল। কিন্তু 'মগের মুলুক' প্রকাশের ফল হল কবির পক্ষে বিষময়। গোবিন্দ দাস এই কাব্যের দ্বারা রাজা ও রাজ মন্ত্রীর সামাজিক প্রতিপত্তির মূলে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন। সুতরাং তাঁর শত্রুরা নিশ্চেষ্ট রইলেন না। সামাজিক মর্যাদার পুনরুদ্ধার ও কবিকে ধরাধাম থেকে অপসারণের জন্য তাঁরা দ্বিস্তরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রথম স্তরে মানহানির মামলা আনয়ন এবং দ্বিতীয় স্তরে কবিকে ইহজগত থেকে অপসারণ।

১২৯৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহে রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'মগের মুলুক' প্রকাশের জন্য ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে 'প্রকৃতি' পত্রিকার সম্পাদক, কার্যাধ্যক্ষ, স্বত্বাধিকারী প্রমুখের নামে মানহানির মামলা দায়ের করেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আদালত থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়। মামলার নম্বর ৪৬-১৮৯৩ খ্রীঃ। কাব্যের লেখকের নাম জানা সত্ত্বেও তাঁরা সুপরিকল্পিতভাবে গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করেননি। কবি লিখেছেন, "প্রকৃতি'র সম্পাদক আমার লিখিত 'মগের

মুলুকে'র হস্তলিপি কালীপ্রসন্ন ঘোষকে দিয়াছিলেন। এবং আমি যে উহা লিখিয়াছি, তাহাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন আমার নামে মোকর্দ্দমা করিতে সাহস পায় নাই। প্রমাণের আমার অপ্রতুল ছিল না।"[১]

মামলার ধার্য দিনে (সোমবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩ খ্রীঃ আসামীদের উপস্থিত করার জন্য ওয়ারেন্টের দ্বারা কলকাতা থেকে 'প্রকৃতি'র পরিচালকদের গ্রেপ্তার করে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে বিচারক মিঃ কুক্সের আদালতে উপস্থিত করা হয়েছে। সংবাদপত্রে মোকদ্দমার বিবরণ প্রকাশিত হয়: 'Friday, 3 March—The defamation case brought by Babu Kali Prosonno Ghose, the great Bengalee writer of East Bengal and Chief Manager of the Bhawal Estate, against the Editor, Proprietor, Manager and Printer of the *Prakriti*, a vernacular paper published in Calcutta, came on for hearing before Mr. Cox, Joint-Magistrate of Dacca on Monday last. The accused filed a petition through a Muktear for an adjournment of the hearing on the following ground :—That the Editor, Babu Onukul Chander Mookerjee, and the Printer were arrested in Calcutta a few days since, that they had come here but for four days and that the proprietor, Babu Kali Das Banerjee, surrendered himself before the Magistrate the day before, and that under the circumstances they could not properly instruct any pleader. Babu Troylucko Nath Basu M.A., B.L., pleader for the prosecution, having represented to the Magistrate that he was perfectly willing to give the accused all sorts of convenience, the case was postponed till 9th March. The Magistrate ordered that the Editor and Proprietor be admitted to bail in a thousand rupees bond each, and the Printer two hundred and fifty, but the accused being unable to find sureties were sent to Hajat. The Manager not having made appearance, a warrant was issued for his arrest. The court-room was throughout thronged with spectators."[২]

কালীপ্রসন্ন যাতে কবির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন, সেজন্য মামলার সংবাদ লাভের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র ঢাকা থেকে কালীপ্রসন্নের অভিযোগের নকল সংগ্রহ করেছেন এবং কেবলমাত্র তাঁর প্রচেষ্টায় উপরোক্ত অভিযোগের প্রতিলিপি-সহ 'মগের মুলুক' কাব্য 'প্রকৃতি' পত্রিকার ক্রোড়পত্র-

রূপে পুস্তকাকারে মামলার নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৩ই চৈত্র (২৫শে মার্চ, ১৮৯৩ খ্রী:) তারিখের 'প্রকৃতি' পত্রিকার বিজ্ঞাপনে 'মগের মুলুক' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সংবাদ ঘোষিত হয় এবং প্রচ্ছদপটে কবির নাম মুদ্রিত হয়। 'মগের মুলুক' পুস্তিকাকারে প্রচারিত হইলে দেখিতে দেখিতে কবি গোবিন্দ দাসের নাম সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়িল'[৩] এবং 'মুদ্রিত পুস্তিকাগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া পড়িল।'[৪]

রাজেন্দ্রনারায়ণ-কালীপ্রসন্নের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য গোবিন্দ দাস আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্নের সেরূপ কোনো অভিপ্রায় ছিল না, কারণ তিনি জানতেন যে, মোকদ্দমা চললে গোবিন্দ দাসকে মামলার বাহিরে রাখা যাবে না, তাঁকে মামলার অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে এবং তার ফলে কালীপ্রসন্ন বিপদগ্রস্ত হবেন। পরবর্তীকালে (১৩০৮ বঙ্গাব্দে) রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরে তদীয় বিধবা পত্নী রানী বিলাসমণি দেবী কর্তৃক কালীপ্রসন্নের বিরুদ্ধে কিঞ্চিদধিক দশ লক্ষ সাড়ে বাষট্টি হাজার টাকার দাবিতে আনীত অভিযোগে বলা হয়েছে, "১২৯৯ সনে 'প্রকৃতি' নামে একখানা সংবাদ-পত্র বিবাদীর বিরুদ্ধে কতক সংবাদ প্রকাশ করে, তাহাতে বিবাদী ঐ সংবাদ-পত্রের বিরুদ্ধে ঢাকা ফৌজদারী আদালতে এক মানহানির মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। পরে অপ্রীতিকর রহস্যোদ্ভেদ পরিহার জন্য বিবাদী ঐ মোকর্দ্দমা আপোষ করেন।"[৫]

সুতরাং গোবিন্দচন্দ্রের কিংবা প্রকৃতির পরিচালকদের বিরুদ্ধে মামলা চালাবার কোনো উদ্দেশ্যে কালীপ্রসন্নের ছিল না। হৃত মান-মর্যাদা পুনরুদ্ধার করাই ছিল তাঁর প্রথম দফার মুখ্য লক্ষ্য। তিনি 'প্রকৃতি'র পরিচালকদের উপরে এমন চাপ সৃষ্টি করেছেন যাতে তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বিনা সর্তে আত্ম সমর্পণ করেন। কালীপ্রসন্নের অভিসন্ধি ব্যর্থ হল না। 'তিনিই অনুষ্ঠাতা হইয়া এই মোকর্দ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিলেন।... অতঃপর ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় ঢাকায় একটি সভা আহূত হয় এবং 'প্রকৃতি'-সম্পাদক উক্ত সভায় ঘোষ মহাশয়কে একখানি ক্ষমা-প্রার্থনা-পত্র লিখিয়া দিলেন। সেই পত্রে সম্পাদক অতি বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে বলেন।'[৬] এবং 'মগের মুলুক' প্রকাশের জন্য তিনি কালীপ্রসন্নকে আট হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন।[৭] ফলে মোকদ্দমা আপোসে নিষ্পত্তি ঘটেছে। বিচারক

রায়ে লিখেছেন, "Accused acquitted the case being compromised under section 345 (1), 3rd April, 1893."[৮]

ঢাকার উপরোক্ত সভা ও মামলা নিষ্পত্তির সংবাদ দিয়ে সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে, "We are glad to know that the Prakriti Defamation case has ended in an amicable settlement, the Editor of that paper having offered an ample apology to Babu Kali Prasanna Ghosh. To make the apology effective, a meeting was, at the request of the defendants convened in Dacca by Babu Gobinda Prasad Das, Personal Assistant to Nawab Ahsan Ullah and Babu Dwarka Nath Chuckerbutty, pleader. Although the meeting had a private character, almost the whole town was represented in it, there being present Raja Sreenath Roy of Bhagyakul, Babu Annoda Prosad Roy Choudhury of Kashimpore, and several other Zamindars. There were also present Mr. Garth, Khaja Mohomed Azgar Saheb, besides all the respectable pleaders and many venerable pundits of Vikrampore. The position Kali Prasanna Babu occupies in the Bengalee Kayastha Society and in the Bengalee literary world was dwelt upon by some of the members present, after which they brought the apologists to Babu Kali Prasanna Ghose, who accepted their expressions of sincere regret and assurance of future good conduct, with commendable generosity."[৯]

উপরোক্ত সংবাদে বলা হয়েছে যে, 'প্রকৃতি'- সম্পাদকের অনুরোধে সভা আহ্বান করা হয়েছিল। অথচ গোবিন্দ দাসের জীবনীকার বলেছেন, "অতঃপর ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় ঢাকায় একটি সভা আহুত হয়।" সুতরাং বিচার করা প্রয়োজন, এই সভা আহ্বানের পশ্চাতে কে ছিলেন। ঘটনা-বিশ্লেষণে একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, কালীপ্রসন্ন ঘোষের উদ্যোগেই এই সভা আহুত হয়েছিল। কারণ, প্রথমত মানহানির মামলা আপোসে নিষ্পত্তির জন্য সাধারণত চার দেওয়ালের মধ্যে উভয়পক্ষের আলোচনা হয় এবং বিবাদী-পক্ষ আদালতে দাঁড়িয়ে ক্ষমা-প্রার্থনা করেন; সংবাদপত্রে তা মুদ্রিত হয় এবং বাদী-পক্ষ তাতেই সন্তুষ্ট হন। বিবাদী-পক্ষকে জনসভায় ক্ষমা-প্রার্থনা করতে হয় না। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস এই বক্তব্যকেই সমর্থন করে। জনসভায় সংবাদপত্র-সম্পাদকের ক্ষমা-প্রার্থনার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

সংবাদপত্রের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, আপোসে মীমাংসার জন্য উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। সে অনুযায়ী 'প্রকৃতি'-সম্পাদক অনুকূলচন্দ্র মুখার্জী আদালতে ক্ষমা-প্রার্থনা করেছেন, ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন এবং 'প্রকৃতি' পত্রিকার ২৭এ চৈত্র, ১২৯৯ বঙ্গাব্দের (৮ই এপ্রিল, ১৮৯৩ খ্রীঃ) সংখ্যায় তা মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত এই সভায় সাধারণ মানুষ অনুপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন ভূস্বামী ও মধ্যস্বত্বাধিকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বাকি অংশ ছিলেন সামন্ত-প্রসাদ অভিলাষী পণ্ডিতগণ। এঁদের সমাজে লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল কালীপ্রসন্ন ঘোষের। সে কারণেই উপরোক্ত ক্ষমাপত্রটি কেবলমাত্র সভায় পাঠ করা নয়, তা তিনি সমস্ত সাপ্তাহিক-পত্রে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং কালীপ্রসন্নের নির্দেশে এই সভা আহুত হয়েছিল, 'প্রকৃতি'-সম্পাদকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুরোধে নয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কালীপ্রসন্ন সুপরিকল্পিত ভাবে গোবিন্দচন্দ্রকে এই মামলার অন্তর্ভুক্ত করেননি; অথচ তাঁকেই প্রধান আসামী করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁকে মামলার বিবাদী করলে চাপ-সৃষ্টির দ্বারা ক্ষমা-প্রার্থনা-পত্র আদায়ের সুবিধা কালীপ্রসন্ন পেতেন না। গোবিন্দ দাস মেরুদণ্ডহীনতার পরিচয় দিয়ে ভাওয়ালের সামন্ত-গোষ্ঠীর করুণা ভিক্ষা করতেন না। সুতরাং তাঁকে আসামী না করে কালীপ্রসন্ন প্রখর চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রথম দফার পরিকল্পনা ছিল, 'মগের মুলুক'-এ তাঁর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করা হয়েছে, আদালতে সেগুলিকে অসত্য বলে প্রমাণিত না করে সুকৌশলে অভিযোগগুলিকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে সামন্ত-আভিজাত সমাজে সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রথম দফায় পরিকল্পনাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করে কালীপ্রসন্ন এবারে গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে চরম আঘাত দেবার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। কবি-কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করার জন্য তিনি দ্বিতীয় দফার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

রিক্ত-নিঃস্ব স্বভাব-কবিকে ভাওয়ালের সামন্ত-গোষ্ঠী ক্ষমা করতে পারেননি। তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কবি বেঁচে থাকলে তাঁদের অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে পুনরায় কবি-কণ্ঠ গর্জে উঠবে। সুতরাং গোবিন্দ দাসকে গোপনে হত্যা করার জন্য তাঁরা গুপ্তঘাতক নিয়োগ করেছেন। ঘাতকেরা কবির পিছনে সর্বদা ছায়ার মত ঘুরেছে, তাঁকে হত্যা

করার জন্য ক্রমান্বয়ে আক্রমণ করেছে। কিন্তু কবিকে রক্ষা করবার জন্য নামগোত্রহীন সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা কখনো চিঠি লিখে কবিকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, কখনো পাহারা দিয়ে বিপজ্জনক এলাকা অতিক্রম করতে তাঁকে সাহায্য করেছেন, আবার কখনো কবির উপরে আক্রমণকে প্রতিহত করেছেন।

গুপ্তঘাতকদের হত্যার প্রয়াস সম্পর্কে গোবিন্দচন্দ্র লিখেছেন, "আমি কলিকাতা হইতে, কি অন্য কোথায়ও হইতে ময়মনসিংহে যাইবার সময়, আমাকে রেলওয়ে ষ্টেশনে ধরিয়া মারিবার জন্য ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ের ষ্টেশনে লোক নিযুক্ত···ছিল। আমি রাত্রির গাড়ীতে ছাড়া দিনের গাড়ীতে যাতায়াত করিতাম না। গাড়ীতে উঠিয়াই পার্শ্বস্থ লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদিগকে আমার অবস্থা জানাইয়া ষ্টেশনের নিকট গাড়ী আসিতেই গায় মাথায় কাপড় দিয়া মাথা গুজিয়া টুলের উপর পড়িয়া থাকিতাম। আর সেই লোকেরা আমার রক্ষার জন্য গাড়ীর দরজার নিকট সতর্কভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত।

ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলওয়ের যে সকল ষ্টেশন ভাওয়ালে অবস্থিত, তাহাতে রাজার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। সেই সকল ষ্টেশনে রাজার লোকে গাড়ী হইতে কাহাকেও টানিয়া নিলে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।"[১০]

কবির প্রাণ-হরণের জন্য যাঁরা গুপ্তঘাতক নিয়োগ করেছেন, 'কাপুরুষ' কবিতায় তাঁদের প্রতি প্রবল ধিক্কার-ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে কবি-কণ্ঠে :

"হা রে ভীরু কাপুরুষ হা রে নরাধম,
এতেও সে পাপ আশা,
গেলনা চণ্ডাল চাষা,
গেলনা উন্মাদ তোর সে পাপ উদ্যম ?
আবার সে মোহে মাতি,
পাঠাইলি গুপ্ত ঘাতী,
গোপনে বধিতে মোরে, একি লজ্জা কম
মোর নামে হা রে পাপী,
সত্যই উঠিস কাঁপি,
হিরণ্যকশিপু সম দানব অধম ?

আমি যদি মরে যাই,
বলিবার কেহ নাই,
প্রাণের আতঙ্ক তোর হয় উপশম ”।[১১]

কবির উপরে একদিনের আক্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন গোবিন্দ দাসের জীবনীকার হেমচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি লিখেছেন, “একবার গোবিন্দচন্দ্র, তাঁহার মাতুল শ্বশুরালয় লতপ্‌দী গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। লতপ্‌দীর পশ্চিমে “রাঙ্গা মালীয়া” নদী। তখন বর্ষাকাল। কুলপ্লাবিনী খরস্রোতা নদীর সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া কবি-সুলভ প্রলোভনে তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বে নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার পরমাত্মীয় জনৈক ভদ্রলোক ছিলেন। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে গগনমণ্ডল নীরদমালায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে বারিপাত হইতে আরম্ভ হইল। গ্রাম-পথের দুইদিকে ঘন শস্যক্ষেত্র। সেই বর্ষণ-মুখরিত আসন্ন সন্ধ্যায়, দাস মহাশয়েরা শস্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়া গ্রামাভিমুখে দ্রুত প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, হঠাৎ শস্যক্ষেত্র হইতে চারিজন ভীমদর্শন মুসলমান দীর্ঘ বংশদণ্ড হস্তে বহির্গত হইয়া দাস মহাশয়ের মস্তকে একযোগে আঘাত করিতে আরম্ভ করে। তাঁহার মস্তকের ছত্র সেই আঘাতে ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে সেই যাত্রা রক্ষা পাইলেন। অতঃপর তিনি প্রাণভয়ে বেগে পলাইতে আরম্ভ করেন। সে সময় তাঁহার আত্মীয় দস্যুদিগকে বাধা প্রদানে উদ্যত হইলে তাহারা কবিকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই আক্রমণ করে। ইতিমধ্যে জনৈক দুগ্ধবিক্রেতা সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইলে আততায়ীগণ পলায়ন করিল।”[১২]

কেবলমাত্র কবি নন, কবি-সুহৃদরাও কবিকে আশ্রয় দেবার জন্য বিপদাপন্ন হয়েছেন। কবি বন্ধু ও ‘নব্যভারত’ পত্রিকার সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী লিখেছেন, “আমরা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম বলিয়া কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীর কোন লোক এক সময়ে আমাদিগকে হত্যা করার ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছিল। আমরা তাহা “সময়” প্রভৃতি পত্রিকায় ছাপাইয়াছিলাম, এবং রায়বাহাদুরের নিকট অবগতির জন্য প্রেরণ করিয়াছিলাম।”[১৩]

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বভাব-কবির প্রতি বিদ্বৎসমাজের মনোভাব

ভাওয়ালের প্রবল শক্তিশালী সামন্ত-প্রভু ও তাঁর প্রধান মন্ত্রী কালী-প্রসন্নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সহায়-সম্বলহীন গোবিন্দচন্দ্র বাংলার বিদ্বৎসমাজের সাহায্য-সমর্থন লাভ করেননি। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তখনো জীবিত; চাকরি থেকে অবসর-গ্রহণ (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯১খ্রীঃ) করার পর থেকে মৃত্যুকাল (২৬ চৈত্র, ১৩০০ বঙ্গাব্দ। ৮ এপ্রিল, ১৮৯৪ খ্রীঃ) পর্যন্ত তিনি কলকাতায় রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ১৩০০ বঙ্গাব্দের 'বর্ষশেষের কয়েকদিন পূর্বেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।···কলিকাতায় থাকিলে বন্ধুমহলে যান-আসেন। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হয়। মনস্বী লোক বা ইনটেলেকচুয়ালদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য মন অনুক্ষণ তৃষিত থাকে।"[১] এ সময়ে রাজ্যের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই চিন্তা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'শিক্ষার হের-ফের' প্রবন্ধটি 'সাধনা' পত্রিকায় (পৌষ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটির সঙ্গে ঐকমত পোষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছেন এবং সে-চিঠির অংশ-বিশেষ কবিগুরুর মন্তব্যসহ 'সাধনা' পত্রিকার ঐ বৎসরের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁদের মধ্যে কেউই গোবিন্দচন্দ্রের নির্বাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি এবং তাঁর প্রাণ-হরণের প্রয়াস সম্পর্কে চিন্তিত হননি, তাঁর সপক্ষে লেখনী ধারণ করেননি কিংবা রাজেন্দ্রনারায়ণ-কালীপ্রসন্নের অপপ্রয়াস সম্পর্কে কোনো নিন্দা-বাক্যও উচ্চারণ করেননি। 'মগের মুলুক'-এর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা সম্পর্কেও তাঁদের কোনো প্রতিক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "শুনা যায়, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র না-কি এই মোকদ্দমা আপস নিষ্পত্তি করিবার জন্য কালীপ্রসন্নকে পত্র লিখিয়াছিলেন।"[২] কিন্তু জনশ্রুতিকে প্রমাণিত সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া পূর্বেই উল্লেখ করেছি, স্বীয় স্বার্থেই মামলা চালানোর কোনো অভিপ্রায় কালীপ্রসন্নের ছিল না। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র চিঠি লিখে থাকলেও তার দ্বারা গোবিন্দ দাসের কোনো সাহায্য হয়নি।

অত্যাচরিত-উৎপীড়িত মানুষগুলির প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি ও গভীর মমত্ববোধ অভিব্যক্ত হয়েছে 'মগের মুলুক' কাব্যে। এসময়ে কৃষক-প্রজাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করলেই উপলব্ধি করা যাবে কেন তিনি গোবিন্দচন্দ্র সম্পর্কে নীরব ছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন, "চাষী-জীবনের চিরস্থায়ী দারিদ্র্যসমস্যার জন্য দায়ী কে, সে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে সাহস পাইতেছেন না ; সোশিয়ালিষ্টদের মনে পৃথিবীময় ধনবণ্টন সম্বন্ধে যেসব বিতর্ক ওঠে, সংসার-জীবনে তাহা সম্ভব কিনা তদ্‌বিষয়ে কবির সন্দেহ হয়। অসম ধনবণ্টন-নীতিকে সমর্থন না করিয়াও থাকিতে পারেন না। তিনি পূর্বোল্লিখিত পত্রের শেষে লিখিতেছেন, "বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ দীর্ণ বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর এক দিক ঢাকতে গিয়ে আর-এক দিক বেরিয়ে পড়ে—দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায় এবং ধন গেলে সমাজের কত যে শ্রী সৌন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই।"[৩] উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জমিদার। সেকালের অন্যান্য জমিদারদের পদাঙ্ক অনুসরণ না-করলেও ভূমি-নির্ভরতা কবিগুরুর উদারনৈতিক চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। তাই প্রজাদের সঙ্গে যখন তাঁর 'সম্বন্ধটা কাব্যলোক হইতে বস্তুলোকে দেনাপাওনার মধ্যে আসিয়া পড়িত, তখন কবিও কল্পলোকের অলীকতা হইতে নামিয়া সাধারণ মানুষের ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন। কারণ কেবল লেখনী চালনা করিলে জমিদারি পরিচালনা করা চলে না।'[৪] সুতরাং যে সামন্ত-ধনশক্তির বিরুদ্ধে গোবিন্দ দাসের বিদ্রোহ, তাকে সমর্থন কিংবা সাহায্য করা জমিদার রবীন্দ্রনাথ কিংবা ভূমিস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তৎকালীন চিন্তাশীল সারস্বত-সমাজের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কাছে পত্রিকা-সম্পাদক ও সাহিত্য-সমালোচক-রূপে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। 'বান্ধব' পত্রিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "ইহা একখানি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র।·· আকারে ক্ষুদ্র হইতেও গুণে, অন্য কোন পত্রাপেক্ষা লঘু বলিয়া আমাদিগের বোধ হইল না। রচনা অতি সুন্দর এবং লেখকদিগের চিন্তাশক্তি অসামান্য। ইহা যে বাংলায় একখান সর্বোৎকৃষ্ট পত্রমধ্যে গণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই।"[৫] ভূস্বামীশ্রেণী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব ছিল কালীপ্রসন্নের অনুরূপ। তিনি লিখেছেন, "আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি।···অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ

প্রশংসাভাজন বিবেচনা করি। যে সুহৃদগণের প্রীতি আমরা এ সংসারের প্রধান সুখের মধ্যে গণনা করি, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে জমীদার। জমীদারেরা বাঙ্গালী জাতির চূড়া, কে না তাঁহাদিগের প্রীতিভাজন হইবার বাসনা করে?"[৬] সুতরাং ভূস্বামী-বিরোধী গোবিন্দচন্দ্রকে সাহায্য করা ভূস্বামী-সুহৃদ বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া তিনি কালীপ্রসন্নের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য-সমালোচনী সভা'র অধ্যক্ষ কমিটির সদস্য ছিলেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ২০ বৎসর বয়সে (১৮৬৩ খ্রীঃ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং তিনি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু মেলা'র আয়-ব্যয় পরীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। 'বান্ধব' পত্রিকার ১২৮৫ বঙ্গাব্দের দশম সংখ্যায় ও ১২৮৮ বঙ্গাব্দের তৃতীয় সংখ্যায় তিনি রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী' ও 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকার প্রশংসামূলক সমালোচনা করেছেন। এই সমালোচনার সুখস্মৃতি বহন করে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাহার 'বান্ধব' পত্রে এই কাব্য-সমালোচন উপলক্ষ্যে লেখককে উদয়োন্মুখ কবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। খ্যাত ব্যক্তির লেখনী হইতে এই আমি প্রথম খ্যাতি লাভ করিয়াছিলাম।"[৭] সুতরাং 'খ্যাত ব্যক্তির লেখনী'র সাহায্যে যে-কবি 'প্রথম খ্যাতি' লাভ করেছেন তাঁর পক্ষে সেই 'খ্যাত ব্যক্তি' কালীপ্রসন্নের বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ তিনিও দেনাপাওনার প্রশ্নে 'সাধারণ মানুষের ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন।'

কালীপ্রসন্ন যখন সামন্ত-শত্রু গোবিন্দ দাসের প্রাণ-সংহারে উদ্যত, তখন ভূম্যধিকারী-সমাজ কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩০১ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৭ জুন, ১৮৯৪ খ্রীঃ) সামন্ত-সেবক কালীপ্রসন্নকে সাহিত্য পরিষদের সর্বোচ্চ সম্মান 'বিশিষ্ট সদস্য'-রূপে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করেছেন। তিনি ১৩১০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং ১৩১৩ বঙ্গাব্দে পুনরায় উক্ত পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৩০৪, ১৩০৫ ও ১৩০৭ বঙ্গাব্দে কালীপ্রসন্ন সাহিত্য পরিষদের ত্রয়ী সহ-সভাপতির অন্যতম রূপে নির্বাচিত হয়েছেন। সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য এসময়ে পরিষদের নিয়মানুযায়ী তাঁর বিশিষ্ট সদস্য পদ ছিল না। সহ-সভাপতির পদাধিকার বলে তিনি সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে গঠিত বিভিন্ন উপ-

সমিতির সদস্য হয়েছেন। ১৩১০ বঙ্গাব্দের ১৯ জৈষ্ঠ্য তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রায় কালীপ্রসন্ন বাহাদুরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন।[৮] এই একনিষ্ঠ সেবকের প্রতি শ্বেতাঙ্গ-প্রভুরাও উদাসীন ছিলেন না। তাঁরা কালীপ্রসন্নকে 'রায় বাহাদুর' (জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ) ও 'সি. আই. ই.' (জানুয়ারি, ১৯০৯ খ্রীঃ) উপাধি দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন।

কিন্তু হায়! গোবিন্দচন্দ্র অনাদৃত রয়েই গেলেন। পল্লীর নিভৃত কোণে বসে 'নীলকণ্ঠ কবি সমস্ত গরল নিজে ধারণ করে মরণ-যন্ত্রণাক্লিষ্ট কণ্ঠ থেকে যে গান ধ্বনিত করলেন "[৯] তার তীব্র দাহে দগ্ধ হয়েছিল ভূমি-নির্ভর বিদ্বৎ সমাজ। তাঁর অসংস্কৃত সারল্যে ও দুর্মর হৃদয়াবেগে পাঠক-সমাজ অনুপ্রাণিত হলেও সাহিত্যাঙ্গনের দ্বারপালেরা তাঁকে কবি-রূপে স্বীকৃতি দেননি। তাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বহু স্বল্প প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নানাভাবে সম্মানিত করলেও গোবিন্দ দাসকে কোনো রূপ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি, সম্বর্ধনা-জ্ঞাপন তো দূরের কথা। অথচ 'গোবিন্দচন্দ্রের মত একজন খাঁটি কবি যে জীবিতকালেই সম্বর্দ্ধনার উপযুক্ত ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তবে কেন এমন হইল।'[১০] এমন কি কবির মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে ঢাকা শহরে যে সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় (৩০ চৈত্র ১৩২৪ ও ১ বৈশাখ, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ) তাতেও উপস্থিত হবার জন্য কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। যদিও সম্মিলন চলাকালে কবি ঢাকা শহরে ছিলেন। সম্মিলনে কবির অনুপস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় সম্মিলনের শেষে তাঁর কাছে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছিল। স্বভাব কবি প্রতি সারস্বতসমাজের মনোভাব লক্ষ্য করে 'নব্য ভারত' পত্রিকার সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী বলেছেন, "যাঁহাদের হাতে তিনি অত্যাচারিত হইয়াছিলেন, তাহারা এ দেশের পূজ্য, কিন্তু নির্য্যিত গোবিন্দচন্দ্র উপেক্ষিত, এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই।"[১১]

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে কবি ক্রমেই ক্ষত-বিক্ষত ও দুর্বল-শক্তিহীন হয়ে পড়ছিলেন, তবুও আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে ধনী-জমিদার-দের করুণা প্রার্থী হননি। ইতিমধ্যে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছেন। পরিবার-প্রতিপালন ও জীবনধারণের প্রয়োজনে সামন্ত-যন্ত্রের অধীনে চাকরি করতে বাধ্য হলেও তিনি সামন্ত-শোষণের অংশীদার হননি। পক্ষান্তরে ভূস্বামীশ্রেণীর প্রতি তীব্র ঘৃণায় উদ্দীপ্ত হয়ে কবি বারবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে

দারিদ্র্যকে জীবনের নিত্যসঙ্গী-রূপে বরণ করেছেন। 'জমিদারী কার্য্যে সময় সময় অন্যায় রূপে প্রজাপীড়ন করিতে হয় বলিয়া তিনি আর চাকরি করেন নাই। প্রজাপীড়ন তিনি পছন্দ করিতেন না।'[১২]

গোবিন্দচন্দ্রের জীবনীকার হেমচন্দ্র চক্রবর্তী বলেছেন, "১৩০৩ সনে গোবিন্দচন্দ্রের সেই কর্ম্মহীন অবস্থায় বড়াল-কবি তাঁহাকে একদা কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার "ষ্টেটে" একটি কাজের যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র বহু বন্ধুবান্ধব সমন্বিত চিরপরিচিত ময়মনসিংহে কর্ম্মলাভ করিয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত কার্য্য আর গ্রহণ করেন নাই।"[১৩] এ প্রসঙ্গে আর একজন লিখেছেন, "এমন কি কবি গোবিন্দচন্দ্রের যখন কোন চাকুরী ছিল না, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে তাঁহার এষ্টেটে একটি কাজ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন তাহাও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিরা গিয়াছেন।"[১৪] তবুও মনে প্রশ্ন উদিত হয়, 'মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া'ও গোবিন্দ দাস কেন রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে চাকরি করতে স্বীকৃত হলেন না? তা কি কেবল 'বহু বন্ধুবান্ধবসমন্বিত চিরপরিচিত ময়মনসিংহে'র প্রতি আকর্ষণের জন্য কবি উক্ত অঞ্চলের জমিদারের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেছিলেন, না তাঁর প্রখর আত্মসম্মানবোধ রবীন্দ্রনাথের অধীনে চাকরি করতে তাঁকে অনিচ্ছুক করেছিল? কারণ, এ বিষয়ে গোবিন্দ দাস হেমচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, "তাঁহার আলাপে সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু একটু গর্ব্বের গন্ধ পাইয়াছিলাম।"[১৫] কবির উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যের প্রয়োজন। অথচ তথ্যের একান্ত অভাব। ১৩০৩ সনের কোন্ তারিখে এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং কি ধরনের আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, সে সম্পর্কে রবীন্দ্র-গবেষকরাও কোনো আলোকপাত করেননি। সুতরাং এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন। এ সময়কার রবীন্দ্র-মানসিকতা (যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) এবং পরবর্তীকালের ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথও সামন্ত-বিদ্রোহীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে অনিচ্ছুক ছিলেন। ঠাকুর-এস্টেটে চাকরি দেওয়া সম্পর্কে গোবিন্দ-দাসের উক্তি কবিগুরুর প্রতি নিছক সম্ভ্রমের পরিচায়ক বলে মনে হয়।

১৩১৮ বঙ্গাব্দে দুঃস্থ-রুগ্ণ কবিকে সাহায্যের জন্য সমাজের ৫১জন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র ভাওয়ালের মৃত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের

বিধবা পত্নী রানী বিলাসমণির কাছে পাঠানো হয়। আবেদন-পত্রে তাঁরা লিখেছেন, "আমরা আপনাকে এই অনুরোধ করি যে, যে-কবি স্বামি দেবতার সহিত,—আপনার শ্বশুরকুলের সহিত চিরজীবন জড়িত, সেই দরিদ্র কবিকে আপনি ঢাকা নগরীতে একটি বাসগৃহ প্রদান করিয়া তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করুন। তিনি বিক্রমপুরে এখন যে গ্রামে বাস করিতেছেন, তাহা অচিরে পদ্মাগর্ভে বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে। ভাওয়ালেও এখন বাস তাঁহার পক্ষে কঠিন, সমস্ত কারণ আপনি সবিশেষে অবগত আছেন। পাঁচ কি ছয় হাজার টাকা হইলেই তাঁহার উপযুক্ত বাসগৃহ হইতে পারে। আপনার পক্ষে ইহা ইহজীবনের সংস্থান। আপনি অবগত আছেন যে, আপনার স্বর্গগত স্বামি-দেবতা গোবিন্দবাবুকে একখনি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। আশা করি, এই নিরাশ্রয়, বঙ্গ সাহিত্যের কীর্ত্তিমান কবিকে আপনি একটি বাসোপযোগী গৃহ প্রদান করিয়া রাজবংশের পূর্ব্বগৌরব ও বদান্যতা অক্ষুন্ন রাখিবেন।"[১৬] এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষরিত ৫১ জনের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সারদাচরণ মিত্র প্রমুখের নাম অনেকে উল্লেখ করলেও কেউই কবিগুরুর নাম উল্লেখ করেননি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থেও এ বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই। সুতরাং অনুমান করতে কষ্টকর হয় না যে, এই আবেদন-পত্রে কবিগুরুর স্বাক্ষর ছিল না। বলা বাহুল্য এই আবেদন ব্যর্থ হয়।

তাছাড়া এই বৎসরের ১ চৈত্র (১৪ মার্চ, ১৯১২খ্রীঃ) তারিখে গোবিন্দ দাসের সাহায্যার্থে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট্ হলে এক জনসভা আহ্বান করা হয়। সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়:
"A Literary meeting - A literary evening will be held at the Calcutta University Institute on Thursday the 14th March at 6 p. m. under the presidency of Babu Hirendra Nath Dutta in which a paper will be read on "The poetry of Govinda Chandra Das" by Babu Girija Sankar Roy Choudhuri M. A. Babu Beharilal Sarkar, Suresh Chandra Samajpati, Akshay Kumar Boral, Debiprasanna Roy Choudhury and others will take part in the discussion. The public are cordially invited to attend."[১৭]

এই সভা নির্দিষ্ট সময়ে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "বাঙ্গলা দেশে ভাওয়ালের মত কত শত পল্লী বিদ্যমান। ভাওয়ালে যে অত্যাচারের কথা বাংলার কাব্যসাহিত্যকে আজ চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করিয়াছে—কে জানে হয়ত সেই অত্যাচার, দূরদিগন্তে অজ্ঞাত অখ্যাত কত শত পল্লীর সামাজিক জীবনকে আজও প্রপীড়িত করিতেছে। বাংলার দূর পল্লীর সামাজিক জীবনের ইহা এক অতি বীভৎস চিত্র। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস বাঙ্গালীর এই সামাজিক জীবনের অতি দক্ষ ও ভুক্তভোগী কবি।"[১৮]

সভার বিস্তৃত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে :

"Poet Govinda Chandra Das of Bhowal

A very well attended public meeting, presided over by Babu Hirendra Nath Dutta M A., B.L., was convened at the Calcutta University Institute by the junior members. Babu Girija Sankar Roy Choudhuri M, A., read a very able and interesting paper on the contributions of this poet of East Bengal to the Bengali literature. But the paper was not a merely literary one, for one of the main objects of the essay was to make a public appeal to help the poet, who, as all connected with Bengali literature know, is now in a very sad distressed condition. Poverty and oppression have reduced him almost to the verge of starvation ; and to add to this, there are disease, anxiety and other misfortunes with all their bitterness. Babus Behari Lal Sarkar, Suresh Chandra Samajpati, Panchkori Banerjee, Kulada Prasad Mullick and other made stirring appeals in support of the essayist. In conclusion an announcement was made by the President that a Committee had been formed to help this poor poet might send their contributions, however small, either to the President or to Babu Girija Sankar Roy Choudnuri at 1, Brojogovinda Shah's Lane, Pathuriaghat."[১৯]

বাংলা সাময়িক-পত্রেও উক্ত সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে : "গত ১লা চৈত্র উক্ত ভবনে, গোবিন্দ দাসের কাব্য সমালোচনা ও তাঁহার বর্ত্তমান অভাব লাঞ্ছিত দুর্দ্দশাপীড়িত অবস্থার সাহায্যের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট

সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবনায় ও তৎকর্তৃত্বে একটি সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে।"[২০]

না, এই কর্মকাণ্ডেও রবীন্দ্রনাথের নাম কোথাও নেই। সভানুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর নাম নেই, সভাতেও তিনি অনুপস্থিত। এসময়ে কিংবা বিভিন্ন সময়ে কবিকে যাঁরা যৎকিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কবিগুরু নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৩ চৈত্র (শনিবার, ১৬ মার্চ, ১৯১২ খ্রীঃ তারিখে কলকাতার ওভার্টুন হলে বিচারক শ্রীচৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ছয় শতাধিক শ্রোতার উপস্থিতিতে কবিগুরু 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেছেন। এই সভানুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি প্রথমে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার ৫৮ সংখ্যায় (৯ মার্চ, ১৯১২খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। তারপরে সভার বিজ্ঞপ্তি পুনরায় 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ৬২ সংখ্যায় (১৪ মার্চ, ১৯১২ খ্রীঃ) ও সভার বিবরণ ৬৬সংখ্যায় (১৯ মার্চ ১৯১২খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং কলকাতায় থেকেও স্বভাব-কবির সাহায্যার্থে অনুষ্ঠিত সভায় কবিগুরুর অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে, গোবিন্দ দাসকে তাঁর জমিদারিতে চাকরি দেবার প্রস্তাবটি কবি-কথা মাত্র, বাস্তব-সমর্থিত নয়।

দুঃস্থ-দরিদ্র পল্লীকবির প্রতি সাহিত্যিক-সমাজের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ও অপরিমেয় অবজ্ঞা প্রদর্শন বাংলা সাহিত্যের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। যাঁরা আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর কিংবা সভা করেছিলেন, তাঁরাও কবিকে অর্থসাহায্যের জন্য বিশেষ কিছু করেননি; যদিও তাঁরা অন্যান্য বিষয়ে প্রবল উৎসাহী ছিলেন। তাই অমরেন্দ্রনাথ রায় তৎকালে লিখেছিলেন, "গোবিন্দচন্দ্রের জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখেরই জীবন।—যে জীবন-ইতিহাসের মত জীবন-ইতিহাস দ্বিতীয় দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সে ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক ছত্র করুণ রসে অভিষিক্ত।...গোবিন্দচন্দ্রের চোখের জলের স্রোত সহস্রধারে বরাবর বহিয়াছে—কেহ তাহা মুছাইবার জন্য অগ্রসর হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের পূজা করিবার জন্য বাঙ্গালী যখন বোলপুরে ছুটিয়াছে, রামেন্দ্রবাবুকে পরিষদ-মন্দিরে যখন সোৎসাহে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে, সেই সময় বাঙ্গালার বিখ্যাত কবি গোবিন্দচন্দ্র ক্ষুধার দারুণ দংশনে অস্থির—অভাবের অশেষ ক্লেশে অবসন্ন। মনে পড়ে, ঠিক সেই সময়েই তাঁহার এক স্বনামধন্য কবি-ভ্রাতা দেশের জনকয়েক মান্য-গণ্য ব্যক্তির নাম সহি করাইয়া ভাওয়ালের রাণীমাতার নিকট

এই আবেদনপত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন···বলা বাহুল্য, এ সমবেত সানুনয় অনুরোধ সফল হয় নাই। দেশের ধনকুবেরগণের কর্ণকুহরও উহা ভেদ করিতে পারে নাই। যাঁহারা আবেদন-পত্রে নাম সহি করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ঐ কার্য্যটুকু ছাড়া গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি আর কোনও কর্ত্তব্য করেন নাই।"[২১]

কবিকে সাহায্য করার পরিবর্তে তৎকালীন বুদ্ধিজীবী-সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা গোবিন্দ দাসের নিদারুণ অর্থাভাবের সংবাদ গোপনের চেষ্টা করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত কবি-সম্বর্ধনা সভায় (১২ মাঘ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ) যে-ভাষণ দিয়েছেন, তা ছিল সত্যের বিপরীত চিত্র। তিনি বলেছেন, "ইউরোপীয় সাহিত্য-সেবীদিগের ইতিহাস পাঠ করিলে অনেক হৃদয়-বিদারক ঘটনা অবগত হওয়া যায়। সেখানে হোমারের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত কবি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া জীবন শেষ করিয়াছেন; মিণ্টন নানারূপ দুঃখে জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন এবং দান্তে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। আমাদিগের বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, এদেশে কোনও কবি উপেক্ষিত হইয়া জীবনযাপন করেন নাই; এবং এক অন্ধ কবি হেমচন্দ্র ভিন্ন আর কেহ বিশেষ কষ্ট ভোগ করেন নাই।"[২২] অথচ গোবিন্দ দাস সে সময়ে জরাজীর্ণ দেহে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন অতিবাহিত করছেন! তাই সভাপতির অনৃতভাষণ দারিদ্র্যপীড়িত স্বভাব-কবির প্রতি চিন্তাশীলসমাজের হৃদয়হীনতার নিদর্শন।

সপ্তম অধ্যায়

জীবন-সায়াহ্নে কবি

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু (১৩ বৈশাখ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) ও বিধবা রানী বিলাসমণি কর্তৃক ম্যানেজারের পদ থেকে কালীপ্রসন্ন ঘোষের অপসারণের (১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) পরে নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়ায় সুদীর্ঘ এগারো বৎসর পরে গোবিন্দ দাস ভাওয়ালে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত সামান্য পৈতৃক ভূসম্পত্তি তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু কবির অর্থাভাবের নিরসন ঘটেনি। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের পর থেকে সামন্ত-যন্ত্রের অধীনে প্রজা-স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে চাকরি করতে রাজী না হওয়ায় তাঁর অর্থসংকটের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। 'নায়েবী কার্য্যে প্রজা-পীড়ন করিতে হয়, এজন্য ইহা আর তাঁহার ভাল লাগিল না।'[১] যাঁরা গোবিন্দচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য কমিটি গঠন করেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে স্বভাব-কবি উল্লেখযোগ্য সাহায্য পাননি। স্ত্রীপুত্র-সহ তিনি অনশন-অর্ধাশনের সম্মুখীন হয়েছেন। ক্ষুধায় কাতর শিশুসন্তান কবিকে অস্থির করে তুলেছে। যন্ত্রণাদগ্ধ মন নিয়ে তিনি রচনা করেছেন 'আমার চিতায় দিবে মঠ' কবিতা (শ্রাবণ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ)। কবি-চিত্তের তীব্র দাহ বাণীমূর্তি লাভ করেছে আলোচ্য কবিতায়:

"ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!
আজ যে আমি উপোস করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকার দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্‌!
সে দিকেতে নাইক দৃষ্টি,
কেবল তোমাদের কথা মি ',
নির্জলা এ স্নেহ বৃষ্টি
শিল পড়িছে পট্‌পট্‌!

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে

তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !"[২]

উপরোক্ত কবিতায় একদিকে সারস্বত-সমাজের হৃদয়হীন আচরণের জন্য কবি তাঁদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত হেনেছেন, অন্যদিকে তাঁর দুঃসহ অবস্থার করুণ চিত্র এঁকেছেন। কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ায় কেউ কেউ সামান্য অর্থসাহায্য করেছেন। কিন্তু কবির আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন, (২৮ ভাদ্র, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ), "দুধের সের ।০, ।/০, মাছ দুষ্প্রাপ্য। ভাত খাইয়া বাঁচিতে পারি না, দুধ মাছ কি করিয়া খাইব ? একদিন একটা কবিতা লিখিলে পাঁচ দিন মাথা ঘোরে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই আমার এ দুর্দ্দশা হইয়াছে। যা হউক একদিন মরিতে হইবেই। তাহার জন্য চিন্তা কি ?"[৩]

দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে কবি অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। আশাহীন-ভরসাহীন কবির কণ্ঠে শোনা যায় বিদায়ের রাগিণী :

"আর্ত্তনাদ হাহাকার চিরসাথী যে আমার,

দুঃখ শোক - দুই বন্ধু মোর।

যাবার সময় এল' স্তব্ধ হবে কোলাহল,

এখন থামুক কাঁদা তোর।"[৪]

অর্থের সন্ধানে কবি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করছেন। এ সময়ে তিনি হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অর্থাভাবে জীবনধারণে কবি যেখানে অক্ষম, সেখানে চিকিৎসার খরচ চালানো তাঁর কাছে অকল্পনীয়। সুতরাং তাঁকে ঢাকার মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। কবির অসুস্থতার সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, "কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁহার বাম উরুতে একটি দুরারোগ্য বিস্ফোটক হইয়াছিল।"[৫] ১৩২২ বঙ্গাব্দের ২৫ শ্রাবণ তারিখে 'বাঙ্গালী' পত্রিকা কবির অসুস্থতার সংবাদ প্রকাশ করে দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছেন, "গোবিন্দ দাস বাঙ্গালীর জাতীয় কবি। কিন্তু তিনি নিঃস্ব, চিরদিন দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রামে কাতর। আজ তাঁহার দেশবাসী তাঁহার দিকে লক্ষ্য করুন, তাঁহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করুন। হাসপাতালে যাহাতে তাঁহার সুব্যবস্থা হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারিত করুন। নতুবা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে।"[৬] কবির অসুস্থতার সংবাদ

অবগত হয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এগিয়ে এসে কবির চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ঢাকার লেখক-সমাজ দাতব্য-চিকিৎসালয়ে কবির চিকিৎসার সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয়-নীরব। এমন কি দুএকজন ছাড়া আর কেউ অসুস্থ কবিকে দেখতেও হাসপাতালে যাননি। তাঁদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে কবি-সুহৃদ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য পরবর্তীকালে এক পত্রে লিখেছেন, "কয়েক বৎসর আগে কবি গোবিন্দচন্দ্র দুষ্টব্রণে পীড়িত হইয়া ঢাকা হস্পিটালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যসেবীগণের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কামিনীকুমার সেন মহাশয় সর্ব্বদা তাঁহার সংবাদ লইতেন। আর ময়মনসিংহের বাবু কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় মধ্যে মধ্যে যাইয়া কবিকে দেখিয়া আসিতেন। ঢাকার আর সাহিত্যিকগণের মধ্যে কাহাকেও ত একদিন সেখানে দেখি নাই। মিঃ পি,কে, বসু এক কি দুই দিন গিয়াছিলেন। অনেককে আমি নিজেও অনুরোধ করিয়াছি, কেহ সেদিকের ছায়াও মাড়ান নাই।"[৭]

মাসাধিক কাল হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে কবি বাড়ি ফিরে এসেছেন। কিন্তু কবি পুনরায় নিত্য অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয়েছেন। মহাজনের তাগাদা ও দোকানীর কটু কথা তাঁর কাছে সহ্যাতীত হয়ে উঠেছে। তিনি ভাবছেন, হাসপাতালে তাঁর কেন মৃত্যু হল না! ক্ষুধাতুর স্ত্রী-পুত্রের করুণ মুখচ্ছবি দেখে অনশনক্লিষ্ট কবি কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছেন,

"কেন বাঁচালে আমায় ?
চাল ডাল তেল নুন, আবার ভাবিয়া খুন,
জ্বালালে আগুন ফিরে হৃদি কলিজায়,
ক্ষুধিত সন্তান বুকে, গৃহিণী বিষণ্ণ মুখে,
সম্মুখে আসিয়া সে যে আবার দাঁড়ায় !
মুখে নাহি ফোটে ভাষা, মূর্ত্তিমতী ক্ষুৎপিপাসা,
গরাসে গরাসে পেলে গ্রহ তারা খায়,
ভয়ে ভীত চিত্ত মম, অচেতন শব সম,
আতঙ্কে তরাসে তার চরণে লুটায়।"[৮]

কবির চিকিৎসার জন্য কবি-পত্নী তাঁর সামান্য স্বর্ণালঙ্কার শরীর থেকে খুলে দিয়েছেন। তাঁর খালি হাত দেখে কবির মনে হয়েছে, "মরণে বাঁচনে একই, দুয়েতেই খালি হাত—নাহিক উপায়।" কিন্তু বাংলার সাহিত্যিক-

সমাজ নির্বাক-নিথর। পল্লীকবির কাতর ক্রন্দন তাঁদের বিচলিত করতে পারেনি। তাঁদের অবজ্ঞায়-ঔদাসীন্যে কবি-জীবনের অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে এল। অথচ এ সময়ে 'নানা সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্য-সভা ও সাহিত্য-সম্মিলন বাঙ্গালা ভাষার বিজয় নিশান উড়াইয়া দিতেছেন, নানা মনীষী ব্যক্তিগণ এখন বাঙ্গালা ভাষার পঠন পাঠন করিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষার পরিপোষণ করিতেছেন, নানা সংবাদপত্র ও বহু বহু সুন্দর সুন্দর মাসিক পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষার গৌরব ঘোষণা করিতেছেন।'[৯] অথচ যাঁদের অবদানে বাংলা ভাষা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটেছে, তাঁদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল ছিলেন গোবিন্দ দাস।

১৩২৫ বঙ্গাব্দ। কবি জীবনের অন্তিম পর্যায়। 'শেষ জীবনে অসহায়, রোগগ্রস্ত ছিন্নকণ্ঠ কবিকে ভিক্ষার মতো হীনবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল।'[১০] কী নির্মম-নিষ্ঠুর ছিলেন তৎকালীন ভূমি-নির্ভর সারস্বত-সমাজ! তাঁরা কী লজ্জাকর ইতিহাস ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রেখে গিয়েছেন!! যিনি অবহেলা-ভরে ধনদৌলতের আকর্ষণকে অস্বীকার করে দরিদ্র-দুর্বল কৃষক-প্রজাদের পাশে দাঁড়িয়ে সামন্ত-শোষণের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, তাঁকে পথের ভিখারী হতে দেখেছেন, স্ত্রীপুত্র-সহ অনশনে দিন অতিবাহিত করতে দেখেছেন; তবুও তাঁরা তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি। সামন্ত বিদ্রোহীকে তাঁরা ক্ষমা করতে পারেননি। কারণ, তাঁর প্রতি উদার হলে সামন্ত-সমাজ রুষ্ট-ক্রুদ্ধ হবে এবং আর্থিক নিশ্চয়তা লাভ করলে সামন্ত-প্রভুদের বিরুদ্ধে পুনরায় দ্বিগুণ শক্তিতে কবি-কণ্ঠ গর্জে উঠবে- নড়ে উঠবে সামন্ত-যন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি। সুতরাং বিদ্রোহীর কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হওয়াটাই তাঁদের কাম্য।

অন্তিমকালের জীবনযন্ত্রণায় বিপর্যস্ত কবি-জীবনের করুণ চিত্র পাওয়া যায় পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের চিঠিতেঃ "কবি যে কত দুঃখ সহ্য করিতে পারেন, কবির ভাগ্যে যে কত দুঃখ ভগবানের কল্পনায় স্থান পাইয়াছে, কবিবর গোবিন্দবাবুকে দেখিয়া তাহা অনুভব করিতেছি। আজ রাত্রি ৮ টার সময় বাসায় আসিবার পথে কবির সহিত একত্রেই আসিতেছিলাম। পাটুয়াটুলী হিরণ কুটীরে একখানি ক্ষুদ্র প্লেটে তিনি নুন জল দিয়া চিঁড়া খাইতেছিলেন। পথে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'কি খাইব পূর্ণবাবু? আজ ঠিক ৩০দিনের মধ্যে মাত্র ৮বার ভাত খাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে! অর্থাভাবে

হোটেলে নিত্য খাইতে পারিনা। তাই তিন বেলা তিন পয়সার চিঁড়া খাইয়া প্রাণ রক্ষা করি!' ভাই! গোবিন্দবাবুর যে কি দুঃখ তাহা কাহাকে বলিব? গত মাঘ মাসে তাঁহার দ্বিতীয় ছেলে বরুণকে লইয়া কত জনের দ্বারস্থ হইয়াছেন, শুধু চারিটি ভাতের জন্য। বরুণ এখানে স্কুলে পড়ে। ঢাকায় এমন কেউ নাই যে, কবির ছেলেটাকে ভাত দেয়। এত যে দুঃখ - তবু তাঁর মুখে হাসি, কথায় মধু!"[১১]

মৃত্যুর চার দিন পূর্বে (৯ আশ্বিন, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ) লিখিত কবির চিঠিতে তাঁর অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করা যায়, "বড় ছেলেটা পূর্ব্বেই পড়া ছাড়িয়াছে, বরুণকেও খরচের অভাবে ঢাকায় রাখিয়া পড়াইতে পারিতেছি না। গ্রামের স্কুলেও ভর্তি করে না।"[১২]

কবির দুঃখকর জীবনের অন্তিম পর্যায় সম্পর্কে অক্ষয়কুমার মৌলিক বিদ্যা-ভূষণ লিখেছেন, "কবি নিজ মুখে বলিয়াছেন আমার পথ্য তিন বেলাই জলচিড়া!! কবি পাটুয়াটুলীর এক দোকানে বসিয়া জল নুন দিয়া চিড়া ভক্ষণ করেন আর দিন কাটান। ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া ছাতা—জুতাহীন পায়ে সহর ভ্রমণ—এই ত তাঁহার কাজ। এই আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের কবির মর্য্যাদার শেষ।"[১৩]

এ সময়ে ভাওয়ালের রাজ পরিবারের পক্ষ থেকে গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে বাকি খাজনা বাবদ ৭০০ টাকার জন্য নালিশ করা হল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ অক্টোবর (১৪ আশ্বিন, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ) তারিখের মধ্যে খাজনার টাকা জমা দিতে অক্ষম হলে কবির সামান্য ভূসম্পত্তি নীলামে বিক্রি করা হবে। কবি কর্পদকশূন্য, কোথা থেকে তিনি ৭০০ টাকা সংগ্রহ করবেন? তবুও রোগগ্রস্ত জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে অর্থের সন্ধানে কবিকে পথে বেরুতে হয়। গৌরীপুর, ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে তিনি যে যৎসামান্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন, তা থেকে আহারের জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করতে পারছেন না—যেমন করেই হোক জোত-জমি রক্ষা করতে হবে। অথচ অনাহারে-অর্ধাহারে কবির জরাগ্রস্ত দেহ কঙ্কালসার হয়ে উঠেছে। কবির চিঠিতে এ সময়কার অন্ধকারময় দিনগুলির চিত্র পাওয়া যায়: "আমি হয়ত পূজার সময় বাড়ী যাইব। আজ ছয় সাত দিন যাবৎ জ্বর হওয়ায় বড় কষ্ট পাইতেছি। আজও ভাত খাই নাই; এই অবস্থায় কাছারিতে ঘুরি।...আমার শরীর এবার বড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা বিদেশে থাকিয়া

অনিয়মিত ও অনুপযুক্ত আহারে স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর ডান কাঁধে বাতে ধরিয়াছে।"[১৪]

খাজনা পরিশোধের জন্য বাকি টাকা কবি এখনো সংগ্রহ করতে পারেননি। সে-চিন্তায় তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে—তিলে তিলে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। ঢাকা শহরের নিকটবর্তী নারান্দিয়ায় তিনি আত্মীয় স্বজন-বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় নিদারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগ করছেন। বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে কবি শেষ জীবন-সংগ্রামে রত। ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে ১০০ টাকা মৃত্যুর পূর্বদিনে (১২ আশ্বিন ১৩২৫ বঙ্গাব্দ) কবিকে সাহায্য দিয়ে সম্মিলনের কর্তা-ব্যক্তিরা অপরাধ-স্খালনের চেষ্টা করেছেন। এই অর্থের দ্বারা খাজনা পরিশোধের ব্যবস্থা হলেও কবির চিকিৎসা-পথ্যের কোনো সুরাহা হল না। অসহায় অবস্থায় কবিকে মরণোন্মুখ দেখেও কর্তা-ব্যক্তিরা বিচলিত হননি; চিকিৎসারও কোনো ব্যবস্থা তাঁরা করলেন না।

রণক্লান্ত সামন্ত-বিদ্রোহী কবি-জীবনের শেষ প্রভাত। মৃত্যুপথ-যাত্রীর পাশে কেউ নেই। প্রভাতের সূর্য দিন-পরিক্রমা শেষে 'অস্তমিত হইলেন। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—গভীর অন্ধকারে সমস্ত জগৎ আবৃত হইল। ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠ নারান্দিয়ার জনকোলাহল নিস্তব্ধ হইল। পূর্ব্ব কথিত বাড়ীর একটি কক্ষে মরণোন্মুখ কবি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইহাই কবির শেষ যুদ্ধ। গৃহকোণে একটি প্রদীপ তৈলাভাবে মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছিল। কবির জীবন-প্রদীপ তখন নির্ব্বাণোন্মুখ। আর কবির শিয়রে ও পদপানে তাঁহার দুইটি অসহায় পুত্র থাকিয়া থাকিয়া নিদ্রালস নয়নে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। বাইরে ঘনান্ধকার—প্রকৃতি স্তম্ভিত—যেন কবির অন্তিম মুহূর্তে কালিমময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছিল। সেই ভীষণ রজনীতে, সেই অসহায় অবস্থায় মুমূর্ষু কবির পুত্র দুইটিকে সান্ত্বনা দান করিতে নিকটে কেহ উপস্থিত ছিল না।'[১৫] কবি-জীবনে অমানিশার অন্ধকার-শেষে প্রভাতের সূর্যোদয় ঘটল না। ১৩ আশ্বিন ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৮ খ্রীঃ) শেষ রাত্রে ৫টা ১৫ মিনিটে সামন্ত-শোষিত বাংলাদেশে শোষণ-মুক্ত জীবনের গায়ক গোবিন্দ দাস শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। 'অন্ত মুহূর্ত্তে, অন্তিম তৃষায় তাঁহাকে আমরা একটুও জল দিতে পারি নাই।"[১৬]

মৃত শত্রুকে ক্ষমা করা নাকি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য। কিন্তু প্রয়াত

কবি গোবিন্দদাসের ক্ষেত্রে এই জাতীয় ঐতিহ্য পালিত হল না। মৃত সামন্ত বিদ্রোহীকে ভূমি-নির্ভর বিদ্বৎসমাজ ক্ষমা করতে পারেননি। প্রয়াত প্রজা-হিতৈষী কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন কিংবা শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে ঢাকার লেখক-সমাজের কেউই কবির বাসস্থানে কিংবা শ্মশানে উপস্থিত হননি। 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রিকা লিখেছে, "বাণী-বরপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যু বড়ই শোচনীয়। অর্থাভাবে তাঁহার চিকিৎসা একপ্রকার হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না; তারপর, আত্মীয়স্বজন অভাবে তাঁহার সেবাশুশ্রূষাও রীতিমত হয় নাই; অধিকন্তু তাঁহার শবদেহ 'রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকগণ' কর্তৃক শ্মশানে নীত ও ভস্মীভূত করা হইয়াছে।"[১৭]

গোবিন্দদাসের দেহান্তে সামন্ত-প্রভুর প্রসাদ-ভিক্ষুরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন, কিন্তু বিচলিত হয়েছেন লাঞ্ছিত-বঞ্চিত রায়ত-সমাজ। তাঁদের শোষণ-বিড়ম্বিত জীবনের দুঃখ-বেদনাকে কাব্য-রূপ দেবার মতো দুর্জয় সাহস তৎকালের কোনো কবির ছিল না। তাই 'কবি গোবিন্দদাসের মৃত্যুর পর সমগ্র বঙ্গদেশে বিক্ষোভের স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের অগণিত নরনারী নীরবে অশ্রুবারিতে তাঁহার তর্পণ করিয়াছিলেন।"[১৮]

কবি-প্রয়াণে 'ঢাকাপ্রকাশ', 'বঙ্গরত্ন', 'সৌরভ', 'নব্যভারত,' 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' ইত্যাদি সাহিত্য-পত্রিকার কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সংবাদ-মন্তব্য-প্রবন্ধ প্রকাশ করে মৃত কবির প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু 'ভারতী', 'সবুজপত্র' ও 'সাহিত্য' পত্রিকার কর্মকর্তারা শোকপ্রকাশসূচক কোনো সম্পাদকীয় মন্তব্য কিংবা কোনো নিবন্ধে তাঁর কাব্য-মূল্যায়ন করেননি। তবে 'ভারতী' পত্রিকার পৌষসংখ্যায় (পৃঃ ৭৪৭) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লিখিত 'কবির তিরোধান (স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের দেহান্তে)' শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হয়। ভূস্বামী-পৃষ্ঠপোষিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সামন্ত-হিতৈষী কালীপ্রসন্ন ঘোষের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য বিশেষ অধিবেশন (১২ ভাদ্র, ১৩১৭। ২৮ আগস্ট, ১৯১০) আহ্বান করেছেন। সভার বক্তা ছিলেন সারদাচরণ মিত্র, চন্দ্রশেখর কর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বিহারী লাল সরকার, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সভায় দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়ঃ (ক) মর্মবেদনা প্রকাশপূর্বক শোকপ্রস্তাব (খ) কালীপ্রসন্নের স্মৃতিরক্ষার জন্য 'সমুচিত ব্যবস্থা' অবলম্বনের সংকল্পসূচক প্রস্তাব।[১৯] কিন্তু সামন্ত-বিদ্রোহী গোবিন্দদাসের মৃত্যুতে তাঁরা সাধারণ

মাসিক অধিবেশনে (২২ অগ্রহায়ণ ১৩২৫। ৮ ডিসেম্বর, ১৯১৮) অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করেন। সভায় স্বভাবকবির সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন মাত্র দুজন—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং সভাপতি মহাশয়। কিন্তু তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁরা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি।[২০] এ-ভাবেই তাঁরা প্রয়াত স্বভাবকবির প্রতি দায়সারা গোছের কর্তব্য পালন করেছেন। অবশ্য শোক প্রকাশের কোনো নৈতিক অধিকার তাঁদের ছিল না। সে-কথা স্মরণ করিয়ে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা লিখেছে, "বাঙ্গালীর খাঁটি কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মরিয়াছেন,—না, না, মরিয়া বাঁচিয়াছেন। নানা কষ্ট সহ্য করিয়া অর্দ্ধাশনে, অনশনে সুদীর্ঘকাল কাটাইয়া আমাদের চিরদরিদ্র পল্লী-কবি গোবিন্দ দাস মরিয়া গিয়াছেন। এখন তোমরা সভা কর, বক্তৃতা কর, তাঁহার 'চিতায় মঠ' দেও! সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা বাঙ্গালায় জন্ম-গ্রহণ করিয়া যে এত কষ্ট পাইয়া মরিয়াছে, সাবধান! তাঁহার জন্য কেহই শোক-প্রকাশ করিও না, সে-অধিকার আমাদের নাই।"[২১]

অষ্টম অধ্যায়
কবির জীবনবোধ

গোবিন্দচন্দ্র দাস বাংলা কাব্যজগতে মানবতাবোধ ও বস্তুকেন্দ্রিক জীবন-চেতনার জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন। কবির সমগ্র জীবন তিক্ত-কঠিন সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত। যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের ফসল গোবিন্দ দাসের কবিতাবলী। বস্তু-জীবনকে কেন্দ্র করেই কবি-ভাবনা আবর্তিত। ধূলি-ধূসরিত জীবনের বাহিরে কোনো অতীন্দ্রিয় জগতের আকর্ষণ কবি-চিত্তকে আকুল করেনি। রূপাতীত রূপের সন্ধানে তিনি আত্মবিভোর হননি। মর্তজীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের মধ্যে কবি আপনাকে উপলব্ধি করেছেন। পল্লীজীবনের ব্যথা-বেদনাকে রূপ দিতে গিয়ে দুর্মর হৃদয়াবেগে তিনি কাব্য-বীণায় যে-সুরে গান গেয়েছেন, তা তৎকালীন বাংলা কাব্যসাহিত্যে অচিন্তনীয় ছিল। তাঁর 'কবিতার প্রকাশ ভঙ্গির রূঢ় সবলতা ও অকৃত্রিম ভাবানুসারিতা বাংলা কাব্যে এক নূতন সুর ধ্বনিত করিয়াছে।'[১]

স্বল্প-শিক্ষিত গোবিন্দ দাস। ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে অপরিচিত হলেও তাঁর কাব্য-সাধনায় বিঘ্ন ঘটেনি। তাঁর কাব্য-প্রেরণার মূলে ছিল স্বদেশ, স্ব-সমাজ ও স্বজাতি। স্বপ্নময় সৌন্দর্যলোকের ধ্যানে সমকালীন কবিরা যখন বিভোর, তখন স্বভাব-কবি বস্তুলোকের দাবদাহের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। 'গীতিকবিতার সম্রাট বিহারীলাল বা অক্ষয়কুমার, দীনেশচরণ বা নিত্যকৃষ্ণ, বিজয়চন্দ্র বা চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল, কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। কেননা, তাঁহারা সকলেই ইংরাজী সাহিত্যে গৌরবান্বিত, তাঁহারা উঠিতে বসিতে, শুইতে যাইতে কেবল ইংরাজীর আদর্শ-স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ। সুতরাং গোবিন্দ দাসের তুলনা কেবল গোবিন্দ দাসই।... প্রতি পংক্তিতে অলংকার, প্রতি শব্দে রস, প্রতি ঝঙ্কারে প্রাণ, প্রতি কথায় ভাব, প্রতি বিবৃতিতে মাধুর্য্য এবং তাহাতে মাখামাখি সরলতা ও প্রাঞ্জলতা। এরূপ লেখা এদেশের আধুনিক অল্প সাহিত্যেই প্রস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার পশ্চাতে কোন ঢাক ঢোল বাজে নাই, বুঝি বা তাই তিনি উপেক্ষিত, নচেৎ অনেক নোবেল-প্রাইজ-ওয়ালার তিনি শিরোভূষণ। খোলা প্রাণের উন্মুক্ত গাথা—চাপাচাপি নাই, ঢাকাঢাকি নাই, কুহেলিকা নাই, জটিলতা নাই, দুর্বোধ্যতা নাই,

কুজ্ঝটিকা নাই,—পাদপূরণে কষ্ট নাই, কষ্টকল্পনা কোথাও নাই—যেন অবাধ ফোয়ারা ছুটিয়াছে, যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া যাইতেছে, যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ খেলিতেছে। এরূপ সরল রেখা বর্ত্তমান কালে এদেশে আর কাহারও কাব্যে পাওয়া যায় নাই।'[২]

গগনচুম্বী প্রাসাদে বসে নিশ্চিন্তে-নীরবে কাব্য-আরাধনা নয়, কৈশোরে যাঁদের সঙ্গে ছিলেন, যৌবনে রাজপ্রাসাদের মোহময় আকর্ষণকে অস্বীকার করে কবি তাঁদের মধ্যে ফিরে এসেছেন এবং তাঁদের জীবনের প্রচণ্ড জ্বালাকে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। 'এই জ্বালা দাসত্বের জ্বালা—এই জ্বালা সহায়হীন শক্তিহীনতার জ্বালা।'[৩] সেজন্য তাঁর কাব্যের ভাষা কখনো উগ্র হয়ে উঠেছে, শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে। কিন্তু 'তিনি রুচিবাগীশদিগের জন্য কবিতা লেখেন নাই. পৃথিবীর কোন কবিই বা তাহা করিয়াছেন।'[৪]

ভাওয়ালের অরণ্যরাজি ও পর্বতমালার বিচিত্র সৌন্দর্যে কবি যেমন আকৃষ্ট হয়েছেন; তেমনি মাটির সন্তানদের দুঃখ-দারিদ্র্য তাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। কবির জীবনবোধের মর্মমূলে রয়েছেন ভাওয়ালের উৎপীড়িত-নিপীড়িত কৃষক-সমাজ। সামন্ত-শক্তির শোষণ-পীড়ন কবিকে রিক্ত-নিঃস্ব প্রজাদের পক্ষে মুখর করে তুলেছে। সারস্বত-সমাজের প্রভাবশালী অংশের ন্যায় তিনি নীরব থাকতে পারেননি। রায়ত-কৃষকদের পক্ষাবলম্বনপূর্বক রাজ-সরকারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় রুক্ষ-কঠোর দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছেন। 'তিনি স্বখাত সলিলে আপনাকে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, নচেৎ দুঃখ-দারিদ্র্যের ত্রিসীমায় তাঁহাকে যাইতে হইত না।'[৫] শোষণ ও বঞ্চনা, নির্বাসন ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কবি আজীবন একাকী সংগ্রাম করেছেন। সেই সংগ্রামে তিনি কখনো আশান্বিত, কখনো বা হতাশায় ভারাক্রান্ত, শোষণাবসানের সংগ্রামী আহ্বানে কখনো তিনি উদাত্ত কণ্ঠ, শোষিত কৃষক-প্রজাদের সংগ্রামী চেতনার অভাব দেখে কখনো-বা শ্রান্ত-ক্লান্ত; দারিদ্র্য ও নির্বাসন দণ্ডদানের বিরুদ্ধে তিনি কখনো বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী, স্ত্রী-পুত্রের অনশনে-অর্ধাশনে কখনো বা আত্ম-অবিশ্বাসী। এই চিত্র পাওয়া যায় গোবিন্দ-চন্দ্র দাসের 'প্রেম ও ফুল' (১২৯৪), 'কুঙ্কুম' (১২৯৮), 'কস্তুরী' (১৩০২), 'চন্দন' (১৩০৩), 'ফুলরেণু' (১৩০৩), 'বৈজয়ন্তী' (১৩১২) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থগুলির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কবিতায়, তৎকালীন বিভিন্ন সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলিতে ও 'মগের মুলুক' (১২৯৯) কাব্যে।

ভাওয়ালের সামন্ত প্রভুর প্রসাদ-কণার দ্বারা জীবন পোষণে গোবিন্দচন্দ্র তাঁর মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। প্রজা পীড়নের প্রতিবাদে চাকরি ত্যাগ করে স্ত্রী কন্যাকে ভাওয়ালে রেখে জীবিকান্বেষণে তিনি প্রবাসে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু বিদেশ গমনে তিনি একান্ত ভাবেই অনিচ্ছুক ছিলেন। স্ত্রী কন্যাকে ছেড়ে বহুদূরে প্রবাসে জীবন যাপন কবির কাছে তীব্র মর্মদাহী। তবুও কবিকে রক্তক্ষরিত হৃদয় নিয়ে তাদের ছেড়ে যেতে হয়েছে। 'চাকরি করিতে যাই' কবিতায় কবি বেদনামথিত চিত্তে লিখেছেন,

'যেওনা যামিনি আজি'—হয়োনা প্রভাত,
কি বলিব মাথা মুণ্ড ছাই ভস্ম আর,
হৃদয়ে দারিদ্র্য দুঃখ শক্তি শেলাঘাত,
করিতেছে প্রবাহিত রক্ত শতধার।
নীরবে নিঃশেষে রক্ত হতেছে পতন,
নীরবে অলক্ষ্যে এই হয় অশ্রুপাত,
নীরবে মরমমূল করি বিধুনন,
নীরবে নিঃশেষে এই প্রাণের প্রপাত!
উঠিলে ভাস্কর খুলি পর্ণাবাসে দ্বার,
হাসিব জীবনে 'অন্ন চিন্তা চমৎকার'।' ৬

বিদেশে কবি যে সামান্য অর্থোপার্জন করেন, তার দ্বারা কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চললেও তিনি স্ত্রীকে স্বর্ণালংকার গড়িয়ে দিতে পারেন না। কিন্তু পল্লী প্রেমিক গোবিন্দ দাস। প্রেম ভালবাসা তাঁর কাছে দেহাতীত কোনো অলীক বস্তু নয়। বস্তুকেন্দ্রিক মন তাঁর। তিনি দেহের মধ্যে ভালবাসার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। বলিষ্ঠ দেহানুরক্তি ঘোষিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। তাই স্ত্রীকে গহনা দিতে না পারার অক্ষমতা কবি মনকে প্রবলভাবে পীড়িত করে। 'লজ্জা' কবিতায় কবি কণ্ঠের আক্ষেপোক্তি শোনা যায়,

"দীন বাঙ্গালীর হায়, চাকরিই ব্যবসায়,
তাহাও এ অভাগার ভাগ্যে নাহি জুটিল।
ঘরে বঙ্গবালা প্রিয়া, তারেও গহনা দিয়া,
তুষিবারে দুরদৃষ্টে ঘটে নাহি উঠিল।" ৭

নিজের ঘরে দারিদ্র্যের ছায়া, অথচ প্রতিবেশীর গৃহ ঐশ্বর্য সম্পদে পূর্ণ। কবি দেখেছেন, তাঁর সামান্যতম অলঙ্কার নেই, অথচ ধনিক পরিবারের স্ত্রী-কন্যারা স্বর্ণভূষিতা,

"প্রতিবেশী আছে যারা, সকলেই ধনী তারা,
মেয়ে ছেলে বাপে গায় সোনা রূপা জাডমা।
বসা যে রূপের হাট, উজলে দীঘির ঘাট,
বড় মানুষের মেয়ে কত ভূষা পাবয়া।" ৮

জীবন ধারণের প্রয়োজনে গোবিন্দচন্দ্র বিদেশে সামন্ত প্রভুদের অধীনে চাকরি করছেন। কিন্তু স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দিয়ে বাধ্যত শাসনকারীদের দাসত্ব স্বীকার করে কার আত্মগ্লানি অনুভব করেছেন। তাই কবি কণ্ঠে শোনা যায় প্রবল আত্মধিক্কার:

"বিদেশে দাসত্বে হায়, নিত্য ব্যাধি যন্ত্রণায়,
সহিলাম কত কষ্ট দুখ দুর্নিবার।
প্রেতের অধিক হেন, পিশাচের অবজ্ঞেণ,
কত যত্নে পূজিলাম চরণ তাহার।
মানুষের যা মহত্ত্ব, চিতের স্বাধীন স্বত্ব,
অর্থ লোভে করিয়াছি বিনিময় তার।" ৯

সুদীর্ঘ প্রবাস জীবনে গোবিন্দ দাস মুহুর্মুহু শোকের প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন। যাদের তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন, তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রমদা, পত্নী সারদা ও সহোদর জগচ্চন্দ্রের মৃত্যুতে তিনি ভেঙে পড়েছেন। স্নেহ মমতার প্রত্যাশী কবি এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে কেবল অনাদর অবহেলা পেয়েছেন। প্রিয়জন বিয়োগের ব্যথায় কাতর গোবিন্দ দাস বেদনা মথিত চিত্তে 'কে আছে আমার' কবিতায় লিখেছেন,

"ভিখারী ভিক্ষুক বেশে, ফিরিতেছি দেশে দেশে
পাই না একটু দয়া কাঁদিয়া কোথায়!
একটি স্নেহের ভাষা, একটুকু ভালবাসা,
একটি নিশ্বাস দান,—হায়, হায়, হায়,
পাইনা একটু দয়া কাঁদিয়া কোথায়!

কেহই বলে না কথা, কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা,
অনাদরে প্রাণ মন পুড়ে হলো ছাই !
একটুকু ভালবাসা, একটি স্নেহের ভাষা,
একফোঁটা আঁখিজল কোথাও না পাই !"[১০]

দরিদ্র কবি ভেবেছিলেন, হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু সেখান থেকে তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন অভাব-অনটনে পূর্ণ সংসারে। দারিদ্র্যের নির্মম পেষণে কবি রোগগ্রস্ত-জরাজীর্ণ। স্ত্রী-পুত্রের সামান্যতম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে কিংবা পুত্র সন্তানদের স্কুল-শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে তিনি অক্ষম। কিন্তু তিনি পিতা। অবোধ শিশুপুত্রের 'কাঁদ কাঁদ চাঁদ মুখ' স্নেহশীল কবির পিতৃ-হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। 'কেন বাঁচালে আমায়' কবিতায় অক্ষম পিতার যন্ত্রণাকাতর মনের পরিচয় পাওয়া যায়,

"কেন বাঁচালে আমায় ?
ছেলের বইয়ের কড়ি, যোগাইতে প্রাণে মরি,
কোথা পাব ছাতি জুতা ছেঁড়া তেনা গায় !
অবোধ বুঝে না আহা, জেদ করে চায় তাহা,
সে জানে—বাবার কাছে চেলে পাওয়া যায় !
কিন্তু সে মনের দুঃখে, কাঁদ কাঁদ চাঁদ মুখে,
অভিমানে যে সময় ফিরে নিরাশায়,
তোমার 'বাবার প্রাণ', থাকিলে হে ভগবান,
দিতে না এমন প্রাণ দেখিতে আমায় !"[১১]

কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র পিতা হলেও কবি - নিপীড়িত কৃষক-সমাজের বাঙ্‌ময় প্রতিনিধি। তাঁদের ব্যথা-বেদনা, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার রূপকার তিনি। তাই দারিদ্র্যের ভয়াবহ পেষণেও তিনি দমিত নন। 'অপার অকূল বিপদ রাশি' থেকে বাঁচবার জন্য কবি সামন্ত-করুণার ভিক্ষাপ্রার্থী হননি। তিনি পরশ্রম-লব্ধ অর্থের প্রত্যাশী নন। অবহেলাভরে ঐশ্বর্য-সম্পদের প্রলোভনকে অস্বীকার করে কবি সোল্লাসে ঘোষণা করেছেন,

"পরের রক্ত মাংসে তুষ্ট,
সংসারের সে শকুন দুষ্ট,
আমি তারে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ
অবহেলে নিত্যি দেখাই,"[১২]

পেষণাহৃত অর্থের প্রতি কবির তীব্র ঘৃণার কেন্দ্রমূলে ছিল কৃষক-প্রজাদের প্রতি আত্যন্তিক সহানুভূতি ও প্রগাঢ় মমত্ববোধ। কৈশোরে ও যৌবনে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন শক্তিহীন-সম্পদহীন প্রজাদের উপরে ভাওয়াল-রাজার ভয়ঙ্কর পীড়ন-লুণ্ঠন। তাঁদের কাম-লালসার তৃপ্তি-সাধনের জন্য বৌ-ঝিদের অসহায় আত্মাহুতি কবিকে বিচলিত করেছে। কবি তাঁদের কাতর ক্রন্দনের প্রতি বাংলার নরনারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,

'বাঙ্গলার নরনারী,
অই শোন, শোন তারি,
কি যে সে গগনভেদী গভীর চিৎকার
দানবে লুঠিছে তারে,
কাঁদে মাতা হাহাকারে,
পারিনা সহিতে ভাই পারি না যে আর !"[১৩]

গোবিন্দদাসের সংবেদনশীল কবি-মন নারীর লাঞ্ছনা-অবমাননায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। স্বৈরাচারী সামন্ত-প্রভুদের লেলিহান কাম-ক্ষুধাকে তিনি শাণিত লেখনীর আঘাতে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন,

"কত যে জননী বোন,
কাটিয়া ঘরের কোণ,
চুরি করে পিশাচেরা নিশীথ সময় !
কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
কিবা বড় কিবা ক্ষুদ্র,
কি কৈবর্ত্ত মোসল্মান চণ্ডাল নিচয়,
কি নাপিত, কিবা ধোবা,
রসুলেল্লা ! তোবা ! তোবা !
কর্ম্মকার চর্ম্মকার কেহ বাদ নয়।"[১৪]

উনিশ শতকের ভাওয়ালের কৃষক-সমাজ স্বাধিকার-বোধ সম্পর্কে অচেতন। সংগ্রামী চেতনায় তাঁরা উদ্বুদ্ধ নন। অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন রায়ত-সমাজ চিরকাল ভাগ্যকেই দোষারোপ করেছেন। তাঁরা আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী। সামন্ত-শক্তির দোর্দণ্ডপ্রতাপে তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত। কবি তা লক্ষ্য করে লিখেছেন :

"পূর্ব্ববঙ্গ রাজধানী ঢাকার নিকটে,
মূর্খতা—আঁধারে ঢাকা ভাওয়ালের বন,

* * *

নাহি লজ্জা, নাহি মান, নাহি অপমান,
সদা থাকে অধোমুখে লাথি ঝাঁটা খেয়ে,
না আছে আপন স্বত্ব-অধিকারজ্ঞান,
অকূলে ভাসিছে 'পানা' কূল নাহি পেয়ে!"[১৫]

কৃষক-রায়তের প্রতিরোধ-চেতনার অভাব কবিকে বিমর্ষ-পীড়িত করেছে। কৃষক-সমাজ একান্তভাবেই আত্ম-অচেতন। তাঁরা 'নাহি জানে প্রতিকার কিংবা প্রতিশোধ।' জন-চেতনায় 'একটি স্ফুলিঙ্গ নাই।' কবির কাছে প্রজাদের সহ্যশক্তি কাপুরুষতার পরিচায়ক বলে মনে হয়েছে। অপ্রতিবাদে-অপ্রতিরোধে শোষক-লুণ্ঠকদের কাছে তাঁদের আত্মসমর্পণ দেখে গোবিন্দ দাস ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছেন,

"বল আর কত সবে,
জীবিত থাকিয়া হেন মৃতের মতন?
লুঠে নিল সরবস্ব,
ক্ষেতের সুপক্ক শস্য,
দেখ না কি হে লাঙ্গলী কৃষীবলগণ?
দেশ নাশে দস্যুচোর,
কারো নাই গায়ে জোর,
সবাই মূষিকগর্ত্ত কর অন্বেষণ!
পৃথিবী বিদার' যাতে,
সে লাঙ্গল আছে হাতে,
পার না শত্রুর বক্ষ করিতে কর্ষণ?
বিদেশীরা নানা ছলে,
ভীরু কাপুরুষ বলে,
কেমনে সহিছ বল এত কুবচন?"[১৬]

কিন্তু কবি জানেন, অবহেলিত-পদদলিত মানুষের উত্থান ঘটবেই। অধিকার-বোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা একদিন ভূস্বামী শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন এবং তাঁদের বিদ্রোহাগ্নিতে ভাওয়ালের সামন্ত-গোষ্ঠী ভস্মীভূত হবে—

ফলে ভাওয়াল 'পরিয়া স্বর্গীয় বেশ, উজলিবে দিক দেশ।' কবি তাই জনচেতনার ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্পর্কে আশাহীন নন। সুদৃঢ় বিশ্বাসে তিনি বলেছেন,

"আজ তারা মহামূর্খ অবোধ অজ্ঞান,
বুঝিল না আত্মহিত, তবু ঠিক—সুনিশ্চিত,
একদিন অবশ্যই করিবে উত্থান,
একদিন ভবিষ্যতে, এই মন্ত্রে শতে শতে,
করিবে ভাওয়ালবাসী আত্ম-বলিদান,—
সে ভীষণ কোচবংশী, অরণ্যে বাঘের অংশী,
প্রকৃতির প্রিয় পুত্র বীর বলবান,
পাপিষ্ঠ অসুরবংশ, অবশ্য করিবে ধ্বংস,
শুলপীতে শূয়র সম বিঁধিয়া পরাণ!"[১৭]

মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী। স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সংগ্রামে তাঁরাই শেষ কথা বলেন, লুণ্ঠক-পীড়কর নয়। হিংস্র দমন-পীড়ন চালিয়েও তাঁদের দাবিয়ে রাখা যায় না। তাঁদের 'কেবল জয়ের ইতিহাস'। অপরাজেয় মানুষের অনির্বাণ প্রাণ-শিখা কবি দেখেছেন। মৃত্যুভয়হীন মানুষের গান শোনা যায় কবি-কণ্ঠে:

"আমরা ত জানি না ভয়,
মরণ কিম্বা পরাজয়,
আমাদের এ জীবন কেবল
জয়ের ইতিহাস!"[১৮]

কবি 'তৃণ' কবিতায় তৃণের সঙ্গে কৃষিজীবী মানুষের জীবনের সাদৃশ্য দেখেছেন। তৃণ যেমন সকলের কাছে মূল্যহীন, তেমনি পরশ্রমজীবীদের কাছে রায়ত-সমাজ মর্যাদাহীন—একান্ত অবজ্ঞার পাত্র। তৃণ যেমন পদদলিত-নিষ্পিষ্ট হয়, তেমনি কৃষক-প্রজারাও নিপীড়িত-লুণ্ঠিত হয় (স্মর্তব্য, একালের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যও মেহনতকারী মানুষের সঙ্গে সিঁড়ি, মোরগ, সিগারেট ইত্যাদির তুলনা করেছেন)। গোবিন্দ দাস লিখেছেন,

"আমরা তৃণ—ঘাস,
আমাদেরে ক্ষুদ্র বলি,
তোমরা যাও চরণে দলি,
কথায় কথায় রঙ্গ কর—
ব্যঙ্গ উপহাস,

জগৎটা তোমাদের জন্য,
ভাগী অংশী নাইক অন্য,
আমরা যত অকর্ম্মণ্য
তোমাদের বিশ্বাস !
তাই সে মোদের নাশে রত,
তোমরা আছ অবিরত,
ক্ষুরপী কোদাল লাঙ্গল দিয়ে
নিত্য কর চাষ !"[১৯]

[কবি সুকান্ত লিখেছেন,
"আমরা সিঁড়ি,
তোমরা আমাদের মাড়িয়ে
প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যাও,
তারপর ফিরেও তাকাও না পিছনের দিকে ;
তোমাদের পদধূলিধন্য আমাদের বুক
পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় প্রতিদিন।"[২০]]

তবুও অবজ্ঞাত-দলিত দুর্বলশ্রেণী অকুতোভয়ে মানুষের মর্যাদা দাবি করেন, শোষণ-যন্ত্রকে ভেঙে ফেলার দুঃসাহসিক প্রয়াসে রত হন। সবলের পীড়ন-যন্ত্র তাঁদের অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করতে পারে না। গোবিন্দচন্দ্র পিঁপড়ের মধ্যেও মানব-জীবনের এই পরম সত্যকে অনুভব করেছেন। 'পিপ্ড়া' কবিতায় তিনি লিখেছেন,

২

"ওগো পিপ্ড়ার সারি,
তোমরা জাননা ভয়, পরাজয় কারে কয়,
এত যে চরণে দলি, এত টিপে মারি,
কত ফেলি ঝাটাইয়া, তবু ফিরে আস গিয়া,
তোমরা বেহায়া নও, মহা বীরাচারী !

৩

ওগো পিপ্ড়ার সারি,
সাধিতে কর্ত্তব্য কাজ, নাহি কর ভয় লাজ,
পড়ে যদি শতবাজ নাহি যাও ছাড়ি,

অনায়াসে দেও প্রাণ, রাখ বিবেকের মান,

নহ ভীরু কাপুরুষ পলায়নকারী।"[২১]

তাই গোবিন্দ দাস সামন্ত-অত্যাচার প্রতিরোধে অচেতন-অসংগঠিত রায়ত প্রজাদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়াসে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়েছেন। নারীর সম্মান-রক্ষার্থে তিনি লৌহকঠিন প্রজা-শক্তির বজ্রাঘাতে রাজ-শক্তিকে নতি-স্বীকারে বাধ্য করেছেন। তীব্র ঘৃণায় তিনি স্বেচ্ছাচারী রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু জীবিকান্বেষণে বিদেশ-গমনের সময়ে 'ভার্য্যাসম অতি প্রিয়, মাতৃসমা অদ্বিতীয়' ভাওয়াল-পরিত্যাগে পল্লীকবি অসহনীয় যন্ত্রণা বোধ করেছেন। শোষণ মুক্ত সুস্থ-সবল ভাওয়াল-গঠন ছিল কবির স্বপ্ন। জীবন-রক্ষার প্রয়োজনে প্রবাসে যেতে বাধ্য হওয়ায় তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না। কবি তাই বেদনাসিক্ত কণ্ঠে গেয়েছেন,

"মা!

এই বড় দুঃখ মনে রহিল আমার—

এই কাঙ্গালিনী বেশে,

এত কষ্টে--এত ক্লেশে,

এই বিমলিন মুখ—এই অশ্রুধার,

দেখিয়া যাইতে হ'ল জননী আমার!

২

দেখিয়া যাইতে হ'ল জননী তোমায়,

অন্নপূর্ণা উপবাসী,

আত্মগৃহে পরদাসী,

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মর মর্ম্ম-বেদনায়,

দেখিয়া মরিতে হ'ল জননী তোমায়!"[২২]

বিদেশে গিয়েও গোবিন্দচন্দ্র নিরন্ন-নিঃস্ব প্রজাদের ভোলেননি; স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে তাঁদের 'ম্লান মুখ'। অত্যাচার-উৎপীড়নের দৃশ্য স্বপ্নে দেখে তিনি শিউরে উঠেছেন, প্রতিকারে অক্ষম কবি জাগরণে মাথা কুটেছেন, নিষ্ফল যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। বেদনাহত হৃদয়ে কবি লিখেছেন,

"সরল স্বদেশী মম,

বিদলিছে পশু সম!

আহা হা, সে দুঃখ ভাই, প্রাণে নাকি সয়!
স্বপনে শিহরি উঠি,
জাগরণে মাথা কুটি,
মনে পড়ে ম্লান মুখ সকল সময়!"[২৩]

প্রজাদের বুকফাটা আর্তনাদ কবি-প্রাণে প্রচণ্ড জ্বালা সৃষ্টি করেছে,

"আহা, তার নরনারী, ফেলে যে আঁখির বারি,
অবিচারে ব্যভিচারে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
বারমাস তের কাতি, দিনে রেতে সে ডাকাতি
বুকে বিঁধে সদা মোর শেলের সমান!
তাদের কলিজা-ভাঙ্গা-যাতনা-আগুন-রাঙ্গা,
শিরায় শিরায় জ্বলে শিখা লেলিহান!"[২৪]

শোষণ-জর্জর ভাওয়ালের দৈন্য-দুর্দশা স্মরণ করে সামন্ত-বিদ্রোহীর 'মুমূর্ষু প্রাণ' গর্জে উঠেছে,

"উহুহু!
এখনো মুমূর্ষু রক্ত উঠে উছলিয়া,
শত পুত্রে অভাগিনী,
শত রাজ্যে ভিখারিণী,
স্মরিতে মুমূর্ষু প্রাণ উঠে হুঙ্কারিয়া,
ধিক্কারে শিরায় রক্ত উঠিছে গর্জ্জিয়া!"[২৫]

কৃষক-রায়তদের প্রতি গোবিন্দ দাসের সহমর্মিতা-বোধ ভাওয়ালের সামন্ত-শক্তির ভবিষ্যতকে অনিশ্চিত করে তুলেছিল। ভাওয়ালে কবির অস্তিত্ব প্রতিবাদী-শক্তি সৃষ্টির প্রেরণাস্বরূপ। সুতরাং অঙ্কুরেই সামন্ত-শত্রুকে ধ্বংস করার অজুহাতে পল্লীকবির প্রতি নির্বাসন আদেশ জারি করা হয়েছে। কবির ভাষায় তাঁর অপরাধ হল,

"শুধু তার হিতকামী,
তারে ভালবাসি আমি
বুকের শোণিত দিয়া শুভ তার চাই!"[২৬]

ভাওয়াল রাজার নির্বাসন-দণ্ডাদেশ কবিকে নতজানু করতে পারেনি; আকস্মিক নির্মম আঘাতে কবি-কণ্ঠ স্তব্ধ হয়নি। পক্ষান্তরে কবি লেখনী থেকে

অগ্নিস্রাবী ধারায় কবি-প্রাণের প্রচণ্ড জ্বালা উৎসারিত হয়েছে। 'মগের মুলুক' রচনা করে তিনি সামন্ত-গোষ্ঠীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন,

"দে দেখিয়ে ঘর জ্বালায়ে সাধ্য যদি থাকে,
দেখব তোর ও বড় দালান কার বা বাপে রাখে।"
(—মগের মুলুক। পংক্তি : ৩২৫-২৬)

নির্বাসন-দণ্ডের বিরুদ্ধে বিচার-লাভের আশায় গোবিন্দচন্দ্র রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, পত্রিকা-সম্পাদকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন; কিন্তু তিনি সর্বত্র প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। কেউই ভাওয়াল-ভূস্বামীর বিরুদ্ধে লেখনী-ধারণে সাহসী হননি। তাই সর্বশেষে জনগণের দরবারে কবি বিচারপ্রার্থী হয়েছেন। উৎপীড়কদের স্বরূপ উন্মোচন করে তিনি লিখেছেন,

"তোমরা বিচার কর, আমারে যাহারা,
করিয়াছে নির্ব্বাসিত,
করিয়াছে বিড়ম্বিত,
করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয়দেশ ছাড়া,
পথের ভিখারী করি,
করিয়াছে দেশান্তরী,
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃধনে যারা!

* * *

তোমরা বিচার কর—কে হয় তাহারা!"[২৭]

অত্যাচারের প্রতিবিধান কেবলমাত্র নিজের জন্য নয়, দুঃস্থ-দুর্বল প্রজাদের জন্যেও কবি বিচারপ্রার্থী,

"তোমরা বিচার কর · তোমাদের দ্বারে,
দরিদ্র ভাওয়ালবাসী,
কাতরে কাঁদিছে আসি,
পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে!
সহায় সম্পদহীন,
দরিদ্র দুর্ব্বল ক্ষীণ,
কেমনে যাইব বল রাজার দুয়ারে?

দেখ ভাই দেখ চেয়ে,

দেখ কি যাতনা পেয়ে,

দিন নাই রাত্রি নাই ভাসি অশ্রুধারে ;

* * *

দুবল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে।" [২৮]

রাজ-দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে গোবিন্দ দাস ভূমি-নির্ভর সারস্বত-সমাজের দ্বারে দ্বারে গিয়েছেন। তাঁদের তুহিনশীতল নীরবতা কবিকে পীড়িত-বিচলিত করেছে। জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত কবির কোনো স্থায়ী বসতি নেই। বিভিন্ন দেশে নিরন্তর পরিভ্রমণান্তে তিনি এখন শ্রান্ত-ক্লান্ত—'শোকে দুখে বিষাদিত ব্যথিত কাতর।' বাস্তহীন ভবঘুরে কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মর্মন্তুদ আর্তনাদ :

"কোথা বাড়ী—কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই ?

হায় সে দুঃখের কথা, মলিন মরম ব্যথা,

প্রাণপণে আমি যে তা ভুলে যেতে চাই।

স্মরণে পরাণ পোড়ে, বুক যেন ভাঙ্গে চোরে,

হায় সে দারুণ জ্বালা আজো কমে নাই !

* * *

দেশে দেশে ঘুরি আর কাঁদিয়া বেড়াই ?

কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই ?

* * *

স্মরণে নয়নে অশ্রু বহে দরদর !

হায় সে দেশের কথা, দুঃখময় সে বারতা,

আমি যে রেখেছি বুকে চাপিয়া পাথর !

কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ?" [২৯]

যাঁরা সমাজোন্নয়নের চিন্তায় কাতর, স্বাধিকারের দাবিতে সংবাদপত্রে বড় বড় বিবৃতিদানে মুখর, অথচ তাঁরাই সম্পদহীন-সহায়হীন কবির বিপদে একান্ত উদাসীন, প্রজাদের অসহায় কান্নাতেও বধির। তাঁদের দ্বিমুখী-আচরণে গোবিন্দ দাস তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। তাঁর লেখনীতে বর্ষিত হয়েছে সুতীব্র ঘৃণা,

"সব বেটা ঘুষখোর, সব বেটা জুয়াচোর,

'ধ্বজাধারী' 'আর্কফলা' যার দিকে চাই !

'তু' করিতে মেলে হাত, হেন পায়ধরা জাত,
এমন বিবেকশূন্য দেশের বালাই !
কুকুরের চেয়ে নীচু, যদি আর থাকে কিছু,
আমি যে এদেরি বলি,—ঘৃণা করি তাই।"[৩০]

শোষকশ্রেণীর প্রতি তীব্র ঘৃণার জন্যই সর্বজনীন বেদনার প্রচণ্ডতাকে কবি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন - ব্যক্তিগত বেদনাভূতির মধ্যে তাঁকে আবদ্ধ রাখেনি। তাই সামন্ত-শোষণাবসানের লক্ষ্য নিয়ে গোবিন্দ দাস রায়ত-কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু কবির আরব্ধ কর্ম এখনো অসমাপ্ত — শোষণের জাঁতাকল থেকে মুক্তিলাভ করেননি কৃষক-সমাজ। দাসত্বের বন্ধনে তাঁরা শৃঙ্খলিত। জীবনের প্রান্তে উপনীত হয়েও কবি স্বপ্ন দেখেছেন শৃঙ্খলমুক্তির যজ্ঞ,

"অস্থি তাহার সমিধ কাষ্ঠ, মজ্জা তাহার হবি,
জ্বলছে যজ্ঞ জাতির বুকে স্বপ্নে দেখে কবি !"[৩১]

এই জীবন-যজ্ঞে আত্মাহুতি দেবার মতো সৌভাগ্য আর কিছু নেই। জরা বার্ধক্য সত্ত্বেও জীবন-দানে কাব পিছিয়ে থাকতে চান না। মাতৃভূমির বন্ধন-মুক্তির জন্য গোবিন্দ দাস আত্মবিসর্জনে উন্মুখ,

"যদি মা তোমারি হিতে,
পারি এ জীবন দিতে,
এই রক্ত এই মাংসে হয় প্রয়োজন,
কি আছে সৌভাগ্য আর,
এর চেয়ে মা আমার ?"[৩২]

'অসুরের যত উৎপীড়ন' নির্মূল করার জন্য কবি 'অভিমন্যুর মত বর্ষ অভয় মৃত্যু' কামনা করেছেন। গোবিন্দচন্দ্র 'ক্ষুৎপিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ' ও 'রোগে ক্লিষ্ট পদে পিষ্ট', তবুও কবির 'রুদ্ধ শিরায় ক্রুদ্ধ রক্ত স্বপ্নে করে রণ।' তাই তিনি গেয়েছেন মরণ-বরণের গান,

"মরতে হবে—মরব তাহে ক্ষতি কিছু নাই,
পচা মরণ দিওনা আর তাজা মরণ চাই !

মানুষ আমি মরব নাকি অন্ধ কারাগারে.
কাপুরুষ পাতকীর মত চরণ প্রহারে ?
ব্যোমের মত বক্ষ চাহি দিক্‌দিগন্ত খোলা,
জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের মত চাই সে গুলি গোলা !
কালান্ত তার তেজের ছটা জ্বলন্ত প্রলয়,
মৃত্যুমরা মৃত্যু চাহি জীবন-জ্যোতির্ময় !"[৩৩]

'বুকের শোণিত দিলে, যদি তার শুভ মিলে', তবে কাব রক্তাঞ্জলি দিয়ে ভাওয়ালের 'দুখনিশি'র অবসান ঘটাবেন। বহু দূরে সুদীর্ঘকাল নির্বাসনে জীবন-যাপন করলেও মৃত্যু-পাগল গোবিন্দ দাস শৃঙ্খলিত ভাওয়ালবাসীর বন্ধন-মুক্তির জন্য সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন,

"পাঁচটি বছর যায়, যদিও দেখিনা তায়,
যদিও অনেক দূর আছি ব্যবধান,
তথাপি করেছি পণ, এই রক্ত এ জীবন,
সাধিতে তাহারি হিত—তাহারি কল্যাণ,"[৩৪]

কিন্তু গোবিন্দ দাস জানেন, একক শক্তির দ্বারা বিদেশী শাসক-শক্তি পরিপুষ্ট সামন্ত-যন্ত্রকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ সচেতন জনশক্তি সামন্ততান্ত্রিক পেষণ-যন্ত্রকে ভেঙে কৃষক-সমাজের মুক্তি ঘটাতে পারে এবং তখনই তাঁদের জীবনে অমানিশার ঘোর অন্ধকার দূরীভূত হয়ে নবজীবনের রাঙা প্রভাত আবির্ভূত হবে। সুতরাং পল্লীকবি 'উৎপীড়িত প্রপীড়িত ভাওয়াল উদ্ধার'-কল্পে রক্তদানের জন্য নিপীড়িত ভাওয়ালবাসীর কাছে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন,

"ভাই !
এক হস্তে মুছিবেনা এত অশ্রুজল.
এক ছিঁড়িবেনা এ পাপ শৃঙ্খল !
রক্তের সাগর চাই, এত রক্ত কোথা পাই,
এক বক্ষে নাহি তত শোণিত তরল,
অগস্ত্য-আগ্নেয়আশা. সীমাশূন্য সে পিপাসা,
ব্যাদিত গগনময় গ্রাসে গ্রহদল ;
রক্তের সাগর চাই—কোটি ভুজবল !"[৩৫]

'মোহনিদ্রা' পরিত্যাগ করে 'পরস্পর হাতে হাতে' ধরে দাসত্ব-মুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য কবি-কণ্ঠে বারবার আকুল আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে,

"উঠ হে ভাওয়ালবাসি প্রিয় ভ্রাতৃগণ,
উঠ শীঘ্র মোহনিদ্রা উঠ পরিহরি,
জড়তা আলস্য ত্যজ দৃঢ় কর মন,
উঠ নীচ, ভীরুতারে পদাঘাত করি!"[৩৬]

আর একটি কবিতায় শোষণ-মুক্তির পুনরাহ্বান :

"ওঠ ভাই, পরস্পর হাতে হাতে ধরি,
এমনি করিয়া হয় করিতে উত্থান,
দশ জনে ধর, যদি একজন পড়ি,
দেখিবে অমর বলে হবে বলীয়ান!"[৩৭]

ভাওয়াল-মুক্তির চূড়ান্ত সংগ্রামে কবি পুরোভাগে থাকতে চেয়েছেন—শৃঙ্খল-মোচন সংগ্রামে 'দৈত্যদর্পহারী', 'দৈত্যধ্বংসকারী'-রূপে তিনি সর্বপ্রথমে রক্তদান করবেন। সামন্ত-বিদ্রোহী গোবিন্দ দাসের কামনা—তাঁর আত্মদানে অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত হোক, মুক্তি-সংগ্রাম পূর্ণতা লাভ করুক,

"এস আমি যাই আগে,
প্রাণ রক্ত যদি লাগে,
আমিই তা কণ্ঠ হ'তে করিব অর্পণ,
তোমরা আমার শবে,
দাঁড়ায়ে উঠিও তবে,
স্বর্গের আরেক সিঁড়ি উপরে তখন;"[৩৮]

সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, গোবিন্দ দাসের জীবনবোধ সমাজ-ভিত্তিক—তাঁর কবিতাবলী বস্তুকেন্দ্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ। জীবনে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, দেশে ও সমাজে যে-নারকীয় অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি তা কাব্যে রূপায়িত করেছেন। 'তিনি নিজের সমাজে, নিজের দেশে, নিজেদের জীবন-ঘটনায় কবিতার বস্তু দেখিতে পাইতেন।—তাহা দেখিতে পাইতেন বলিয়াই আজ তাঁহার কবিতার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি।"[৩৯]

নবম অধ্যায়

'মগের মুলুক' কাব্যালোচনা

উনিশ শতকের সংক্রান্তিকালের গণ-মানসে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ব্যঙ্গ-সাহিত্য রূপে 'মগের মুলুক' কাব্য গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। দেশীয় সামন্ত-শক্তির অভ্রংলিহ চূড়া সম্পর্কে ভীতিকর ধারণার অবসানে কাব্যটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। গোবিন্দ দাস আলোচ্য কাব্যে রাজেন্দ্র-নারায়ণ-কালীপ্রসন্নের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করায় জনজীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। 'ভাওয়ালের প্রজাদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার-উৎপীড়নের বহু গোপন কাহিনী ইহাতে পরিপূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হইল। রাজ্যের হোমরা-চোমরাদের তিনি কঠোর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করিলেন; তাহাদের মুখোশ খসিয়া পড়িল!'[১]

প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই 'মগের মুলুক' নিঃশেষিত হলেও পূর্ববঙ্গের জনসমাজে উক্ত কাব্য সংগ্রহের বিপুল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কবির পক্ষে তা পুনর্মুদ্রণের কোনো উপায় ছিল না। কারণ ভাওয়ালের সামন্ত-গোষ্ঠী লুপ্ত সম্মান-মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য পত্রিকা-সম্পাদক, প্রকাশক প্রমুখের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন এবং মামলা প্রত্যাহৃত হলেও 'মগের মুলুক' কাব্য 'আদালতের আদেশে এক্ষণ আর মুদ্রিত হয় না।'[২] তাসত্ত্বেও 'মগের মুলুক' এর প্রচার বন্ধ হয় না। গোবিন্দ দাসের জীবনীকার হেমচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন 'এমন কি অনেকে মুদ্রিত পুস্তিকার অভাবে সমগ্র কাব্যখানি হাতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, এখনও অনেকের কাছে হস্ত লিখিত 'মগের মুলুক' পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে 'মগের মুলুক' বিলুপ্ত হয় নাই—হইবেও না।"[৩]

শ্রী চক্রবর্তীর উক্তি অতিরঞ্জিত নয়। সুদীর্ঘ ৮৩ বৎসর অতিক্রান্ত হলেও কাব্যটি বিলুপ্ত হয়নি। মুদ্রিত কাব্যটির প্রথমাংশ 'নব্যভারত' পত্রিকার ১৩২৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয় এবং পরবর্তীকালে তা বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। বর্তমানে মুদ্রিত কাব্যটি অলভ্য হলেও তার দুটি নকল পাওয়া গিয়েছে। তবে এই নকল দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত দিনলিপির একটি পৃষ্ঠা।

তাছাড়া 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত অংশের সঙ্গে এই নকল দুটির পার্থক্য রয়েছে। একটি নকল করেছেন গোবিন্দ-সুহৃদ কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় হাতে-লেখা পুস্তিকাটি ঢাকা জেলার ব্রাহ্মণগ্রামের অধিবাসী সুধীররঞ্জন চক্রবর্তীর কাছে রয়েছে।

গোবিন্দ দাসের শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ২৭ পৌষ, ১৩২৪ (১১ জানুয়ারি, ১৯১৮) তারিখে রচিত কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রতি" কবিতায় যতীন্দ্রপ্রসাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ও আন্তরিক ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে :

"তোমার কথা ভাবি যখন হৃদয় জাগে অনুরাগে,
ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে স্পর্শ করি সবার আগে।
বক্ষ ফেটে কান্না আসে আমার জাতির দুর্দ্দশায়,
অভাবগ্রস্ত কবির পানে কেউ চাহে না হায় গো, হায়!"[৭]

স্বভাব-কবির মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ কলকাতা থেকে গৌরীপুরে ফিরে গিয়ে 'মগের মুলুক' নকল করেছেন। এ-সম্পর্কে তিনি রোজনামচায় (অপ্রকাশিত) লিখেছেন,

"২রা ফাল্গুন, ২৪—১৪ই ফেব্রু ১৮

বৃহস্পতিবার

আজ সকাল থেকে 'মগের মুলুক' নকল করতে লাগলাম। প্রায় সারাদিন থেকে থেকে কিছু কিছু লিখে ফেলতে লাগলাম।...

৪ঠা ফাল্গুন, ২৪ - ১৬ই ফেব্রু ১৮

শনিবার

পরে 'মগের মুলুক' নকল করলাম কিছু।...

৫ই ফাল্গুন, ১৩২৪—১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৮

রবিবার

...আজ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমার অন্যতম প্রিয় কবি গোবিন্দ দাসের 'মগের মুলুক' কাব্যখানি নকল করে শেষ করলাম।..."

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য মুদ্রিত পুস্তিকা থেকে 'মগের মুলুক' নকল করেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত উপরোক্ত রোজনামচায় পাওয়া যায় না। তাঁর স্বহস্তে নকলীকৃত পুস্তিকায় তিনটি স্থানে সংশোধন রয়েছে—

৭২ পংক্তির 'দুজনেরই', ৯৬ পংক্তির 'একেবারেই' ও ৬৮৬ পংক্তির 'কুসুম'-এর স্থানে সংশোধিত হয়েছে—'দুজনারই', 'একেবারে', 'কসুর'। তাছাড়া ভিন্ন কালিতে কিছু শব্দ স্পষ্ট করে লেখা হয়েছে। যেমন, 'উহা' (১৪০), 'স্বর্গপুরের' (১৫১), 'এমনি' (১৫৫), 'চেয়ে' (১৭২), 'কিবা' (১৭৩), 'কেবল বোতল' (২৬২), 'ঋণ' (২৮৯), 'কসুর' (৬৮৬)। পংক্তি সংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কবি যতীন্দ্রপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র মনুজেন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন, তিনি তাঁর পিতার কাছে শুনেছিলেন কাব্যটি নকল করার পরে গোবিন্দ দাস সংশোধন করেছিলেন; যদিও রোজনামচায় যতীন্দ্রপ্রসাদ সংশোধন সম্পর্কে কিছু লেখেননি। তাই প্রশ্ন দেখা দেয়, গোবিন্দ দাস যদি সংশোধন করে থাকেন, তবে তাঁর সংশোধন সত্ত্বেও 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথমাংশের সঙ্গে নকলীকৃত প্রথমাংশের কিছু শব্দের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কেন? যেমন 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত (অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ ; পৃঃ ৩৫৩-৫৪) অংশে (বন্ধনীর মধ্যে পংক্তি-সংখ্যা উল্লিখিত) 'গাছলায়' (২), 'উত্তরে তার' (৫), 'গাঙ্গের' (৯), 'দিকে পদ্ম' (১৫), 'ধূয়ায়' (২৮), 'ব্যবসা' (৫৬), 'বনের' (৬২), 'মন ভাসে আরেক ঘাটে' (৬৮), 'দুজনারই' (৭২), 'মেনেজারের' (৭৩), 'যে' (৭৬), 'মেনেজারের' (৭৮) ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে নকলীকৃত অংশে রয়েছে 'গাছড়ায়', 'উত্তরেতে', 'গাছের', 'ধারে পথ', 'ধরায়', 'ব্যবসায়', 'ফুলের', 'মন ভাসে তার আরেক ঘাটে', 'দুজনেরই,' 'ম্যানেজুরের,' '(সে)', 'ম্যানেজারের' ইত্যাদি শব্দ। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, যতীন্দ্রপ্রসাদের নকলীকৃত বাকি অংশেও কিছু শব্দের পরিবর্তন ঘটেছে এবং গোবিন্দচন্দ্র যখন যতীন্দ্রপ্রসাদের হাতে-লেখাপুস্তিকাটি সংশোধন করেছেন, তখন তাঁর কাছে মুদ্রিত কাব্য না থাকায় স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করেছেন। ফলে তাঁর পক্ষেও আদ্যন্ত সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। কবি যতীন্দ্রপ্রসাদের স্বহস্তে লিখিত পুস্তিকায় কিছু শব্দের পরিবর্তন দেখে মনে হয়, তিনিও অন্য কোনো হাতে-লেখা পুস্তিকা থেকে 'মগের মুলুক' নকল করেছেন, মুদ্রিত গ্রন্থ থেকে নয়। স্বভাবকবির ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও 'মগের মুলুক' কাব্যের বিপুল চাহিদার ফলে গোবিন্দচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁর কাব্যের অনুলেখনকালে রূপান্তর ঘটেছে। এই ধরনের রূপান্তরিত হাতে-লেখা পুস্তিকা থেকে কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ নকল করায় তাঁর স্বহস্তে লেখা পুস্তিকাতেও কিছু শব্দের পরিবর্তন ঘটেছে।

গোবিন্দ দাসের 'মগের মুলুক' অনুলেখনের সময়ে যে কত ব্যাপকভাবে শব্দের ও বাক্যের পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন হয়েছিল, ব্রাহ্মণগ্রামের অধিবাসী সুধীররঞ্জন চক্রবর্তীর স্বহস্তে নকলীকৃত পুস্তিকাটি দেখলেতা উপলব্ধি করা যায় (তুলনামূলক পাঠের সুবিধার্থে দশম অধ্যায়ে মুদ্রিত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের নকলীকৃত 'মগের মুলুক' কাব্যের শেষে শ্রীচক্রবর্তীর হাতে লেখা পাঠান্তর অংশ সন্নিবেশিত হয়েছে)। শ্রীচক্রবর্তী ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ব্রাহ্মণগ্রামে বসবাসকালে 'মগের মুলুক' নকল করেছেন। প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেছেন, অন্য একটি হাতে-লেখা পুস্তিকা থেকে তিনি এই কাব্যটি নকল করেছেন। তাঁর নকলীকৃত শেষাংশের সঙ্গে কবি যতীন্দ্রপ্রসাদের অনুলিখিত শেষাংশের কোনো মিল নেই। শ্রীচক্রবর্তীর নকলীকৃত শেষাংশে রয়েছে,

"খণ্ডে খণ্ডে পাষণ্ডদের পাইবে উদ্দেশ
'মগের মুলুক' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড শেষ।"

অর্থাৎ 'মগের মুলুক' কাব্যের অন্যান্য খণ্ড লেখার পরিকল্পনা গোবিন্দ দাসের ছিল। কিন্তু এই বক্তব্যের সমর্থনে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। গোবিন্দ দাস স্বয়ং কিংবা তাঁর জীবনীকার অথবা তাঁর সুহৃদদের মধ্যে কেউই কবির উপরোক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলেননি। যদি প্রকৃতই কবির অন্যান্য খণ্ড প্রকাশের অভিপ্রায় থাকতো, তবে তিনি কথা প্রসঙ্গে তা সুহৃদদের বলতেন। অভিপ্রায় গোপন করার মানসিকতা কবির ছিল না; মনে-মুখে এক ছিলেন বলেই তিনি উচ্চবিত্ত-সমাজের শরিক হতে পারেননি। তাছাড়া কবির মুদ্রিত পুস্তকে যদি কবির উপরোক্ত বক্তব্য থাকতো, তবে তৎকালে কবি ও কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে নিশ্চিতই তা উল্লিখিত হ'ত। কিন্তু কেউই তা উল্লেখ করেননি। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, শ্রীচক্রবর্তীর নকলীকৃত শেষাংশটি প্রক্ষিপ্ত—স্থানীয় কোনো কবির দ্বারা সংযোজিত।

এই দুটি নকলীকৃত পুস্তিকার মধ্যে কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের অনুলিখিত পুস্তিকাটিকে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যে নির্ভরযোগ্য বলে আলোচনার জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ, প্রথমত গোবিন্দচন্দ্র যতীন্দ্রপ্রসাদের নকলটিকে সংশোধন করেছিলেন। রোজনামচায় উল্লিখিত না হলেও যতীন্দ্র-প্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র মনুজেন্দ্রের প্রদত্ত এই সংবাদটি সঠিক বলে মনে হয়। গোবিন্দ দাস মৃত্যুর মাস দুয়েক পূর্বে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে শ্রাবণ মাসে গৌরীপুরে গিয়ে যতীন্দ্রপ্রসাদের গৃহে কয়েকদিন আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর সঙ্গে যতীন্দ্রপ্রসাদ যখন কাব্যালোচনা করেছিলেন, তখন অনুমান করা যেতে পারে, তিনি গোবিন্দচন্দ্রকে 'মগের মুলুক'-এর হাতে-লেখা নকল দেখিয়েছিলেন এবং তা দেখে স্বভাবকবি কিছু সংশোধন করেছিলেন। যদি নকলটিতে ব্যাপকভাবে পংক্তিরও শব্দের পরিবর্তন, পরিবর্জন ও সংযোজন থাকতো (যা শ্রীচক্রবর্তীর নকলীকৃত পুস্তিকায় রয়েছে), তবে গোবিন্দ দাস তা সংশোধন করতেন। দ্বিতীয়তঃ যতীন্দ্রপ্রসাদের অনুলিখিত পুস্তিকার যে 'কস্থর' শব্দটি ভিন্ন হাতের লেখায় সংশোধিত হতে দেখা যায়, তা স্বভাবকবির হাতের লেখা বলে গোবিন্দ দাসের পুত্র হেমরঞ্জন দাস জানিয়েছেন। তৃতীয়তঃ কাব্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য। কিছু শব্দের পরিবর্তন সত্ত্বেও যতীন্দ্রপ্রসাদের অনুলিখিত পুস্তিকা থেকে গোবিন্দ দাসকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়। প্রজা-হিতৈষী মনোভাব, সামন্ত-প্রভুদের বিরুদ্ধে সুতীব্র বিদ্বেষ, প্রখর আত্ম-সম্মানবোধ ও দুর্জয় সাহসিকতা, উগ্র-তীক্ষ্ণ ভাষা-ব্যবহার, নাগরিক রূপ-রীতির অভাব ইত্যাদি গোবিন্দ দাসের লেখনী-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল যতীন্দ্রপ্রসাদের অনুলিখিত 'মগের মুলুক' পুস্তিকা।

'মগের মুলুক' কাব্য-রচনার দ্বারা নির্বাসিত গোবিন্দচন্দ্র একাকী নিঃসম্বল অবস্থায় ভাওয়ালের সামন্ত-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসম-শক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। কবি-মনের প্রচণ্ড জ্বালা ও আত্যন্তিক ঘৃণার উদ্‌গীরণ ঘটেছে এই কাব্যে। সম-অনুভূতিপ্রবণ না হলে 'মগের মুলুক'-এ অভিব্যক্ত গোবিন্দ দাসের রোষ, ক্ষোভ ও মর্মযাতনাকে অনুভব করা সম্ভব নয় বা তাঁর কাব্য-মূল্যায়ন যথার্থ হবে না। রুচির বিচারে শালীনতার প্রসঙ্গ তুলে হয়ত অনেকেই নাসিকা কুঞ্চিত করবেন। কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কাব্যালোচনায় রুচি-বিচারের পরিবর্তে রসের বিচারই প্রধান স্থান গ্রহণ করে এবং সে-বিচারে 'মগের মুলুক' কাব্যকে অপাংক্তেয় করে রাখা যায় না। পক্ষান্তরে, এমন তীব্র-উগ্র ভাষায় সামন্ত-অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বর্ষণ, প্রজা-উৎপীড়নের এমন হৃদয়-উত্তেজক বর্ণনা, ভূমি-নির্ভর বিদ্বৎসমাজের স্বরূপ-উন্মোচনে শাণিত লেখনীর এমন দ্বিধাহীন সার্থক প্রয়োগ উনিশ শতকের বাংলা ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব।

'মগের মুলুক' কাব্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক গণসাহিত্য-ধারায় উজ্জ্বল নক্ষত্র-স্বরূপ। এই উক্তি সমর্থিত হবে গোবিন্দদাসের সমকালীন লেখকদের মন্তব্যে। হেমচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন, " 'মগের মুলুক' একখানি বিদ্রূপ রসাত্মক কাব্য। ইহাতে কবি গোবিন্দ দাস ভাওয়াল রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অনেক গুপ্ত কথা ব্যক্ত

করিয়াছিলেন। ভাওয়ালের প্রজামণ্ডলীর উপর অমানুষিক পৈশাচিক অত্যাচার কাহিনী অগ্নিময় ভাষায়, কবি সেই কাব্যে বর্ণনা করিয়াছিলেন। রাজ্যের বহুতর কলঙ্ক কাহিনী, তাঁহার লেখনীমুখে উল্কাবেগে নির্গত হইয়াছিল। যে সকল কাহিনী পাঠ করিতে করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে,—কভু নয়ন অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়—কখনো বা রোষে ধমনীর রক্ত তীব্রবেগে চলিতে থাকে, —আবার কখনো হাস্যরসে মনকে অভিষিক্ত করিয়া দেয়। কাব্যখানির রচনার ভঙ্গিমাও অপূর্ব্ব!! কবিত্বের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে 'মগের মুলুকে'র ভাষা ও ভাব সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। স্বভাবকবির প্রতিভা 'মগের মুলুকে' অতি বিচিত্রভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। এই কবি প্রতীচ্যে আবির্ভূত হইলে একমাত্র মগের মুলুক' তাঁহাকে বিশেষভাবে লোকবিশ্রুত করিতে সক্ষম হইত।"[৫] 'নব্যভারত'-সম্পাদক লিখেছেন, "মগের মুলুকের লেখক ভারতচন্দ্রের যোগ্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। নচেৎ এত অন্তর্জ্বালা উপস্থিত হইত না। তাহার বর্ণনা কত সুন্দর।"[৬] কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেছেন, "তীব্র ব্যঙ্গ কবিতার পুস্তকে এত কবিত্ব আর কোথাও এ যাবৎ দেখি নাই! কী মনোরম কবিত্বেভরা ব্যঙ্গকাব্যখানি।"[৭]

গোবিন্দচন্দ্রের অন্যান্য কবিতার মতো 'মগের মুলুক' কাব্যেও দেশ, কাল ও সমাজের প্রতিফলন ঘটেছে। 'গোবিন্দ দাস পল্লীর সামাজিক জীবনে যে পৈশাচিক অত্যাচার হয় তাহার কবি।'[৮] এবং তিনি সেই পৈশাচিক অত্যাচারের চিত্র এঁকেছেন 'মগের মুলুক' কাব্যে। স্বভাবকবি দেখেছেন, সামন্ত-উৎপীড়নের কেন্দ্রমূলে রয়েছেন নৃপতি-ভূস্বামীশ্রেণী। অত্যাচার-ব্যভিচরের ঠাঁই হ'ল সামন্ত-প্রাসাদ। 'মগের মুলুক' কাব্যে ভাওয়াল রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের রাজপ্রাসাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন,

"বর্ব্বরতার বিরাট্ ভবন ব্যভিচারের ঠাঁই,
ধর্ম্মনাশের কর্ম্মভূমি উহার মত নাই!
কোঠায় কোঠায় ভরা ইহার সতীর হাহাকার,
পালঙ্কে পালঙ্কে কত কলঙ্ক তাহার!" (—পংক্তি : ৩৭-৪০)

তারপরে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

"অত্যাচার অবিচার ব্যভিচারগুলি,
একে একে যত কথা লিখব সবি খুলি!"
(—পংক্তি : ১১১-১২)

সে-প্রতিশ্রুতি কবি রক্ষা করেছেন। রাজ-উৎপীড়নের মর্মন্তুদ কাহিনী তিনি অগ্নিক্ষরা ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। অন্নাভাবে কাতর প্রজাদের ঘর থেকে ফসল-লুঠের বর্ণনা ঃ

"তিন শো গাঁয়ের রায়তগুলি ছিন্ন ভিন্ন করি,
অন্নাভাবে মরিছে সবে হরি হরি হরি !
জমার জমি নাইকো কারো প্রজার হাহারব,
যাদের জমি তাদের কাছে বর্গা দিবে সব !
অধিক ফসল উসল করে কুশল চোরের দল,
ভাগ করিয়ে যাচ্ছে নিয়ে চাষার আশার ফল !"

(—পংক্তি ঃ ৪৩১-৩৬)

অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে রাজ-দরবারে নালিশ জানানোর কোনো অধিকার প্রজাদের নেই। তাসত্ত্বেও যদি কোনো প্রজা অভিযোগ করতে যান, তবে তিনি লাঞ্ছিত-প্রহৃত হন,

"তবু যদি দুঃখী প্রজা তাহার কাছে যায়,
প্যাদা দিয়ে পাইক দিয়ে খেদায়ে দেয় তায়।
অত্যাচারের উৎপীড়নে অঙ্গারকের দল,
টাকার লোভে স্বর্গপুরী দিচ্ছে রসাতল !
পথে পথে গরীব প্রজা কচ্ছে হাহাকার,
পাপিষ্ঠদের পাষাণমনে দয়া নাইক আর !
শিয়াল শকুন যতগুলা সকল গেছে জুটে,
শবের মত স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটে পুটে !"

(—পংক্তি ঃ ২৪১-৪৮)

কেবলমাত্র প্রজাদের দৈহিক লাঞ্ছনা কিংবা ফসল-লুঠ করা নয়, তাঁদের ঘর-বাড়িও ভেঙে-জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়, তাঁরা ভূমি-হারা হয়ে গ্রাম থেকে বিতাড়িত হন,

"হাতী দিয়ে ঘর ভাঙ্গিয়ে ঘর জ্বালাইয়া দিয়া,
কত লোককে দেশ থেকে দিলে তাড়াইয়া।"

(—পংক্তি ঃ ৩২১-২২)

নারীদেহ-লোলুপ ভাওয়াল-নৃপতির লেলিহান কাম-ক্ষুধায় অসহায়া নারীর আত্মাহুতির চিত্র ঃ

"গ্রামের ভিতর যোয়ান বৌ যাহার ঘরে রয়,
রাত আসিলে ভয়ে মরে কার বা কেড়ে লয়!
যমের মত আছে ক'টা রাজার সেপাইয়েরা,
দিনের বেলা খবর করে রেতে ভাঙ্গে বেড়া!
কিংবা যখন ঘরের ছেচে ফেন্ ফেলিতে যায়,
বাঘে যেমন গরু ধরে তেম্‌নি ধরে তায়!
মুখের ভিতর কাপড় ঠেসে দৌড়ে নিয়ে আসে,
এই দালানে একলা স্থানে ধর্ম্ম তাহার নাশে!"

(—পংক্তি : ৪১-৪৮)

কাব্যের শেষে রায়ত-প্রজাদের কাছে সামন্ত-বিদ্রোহী কবির আহ্বান

"জাগ স্বর্গরাজ্যবাসী জাগ জাগ সবে,
কতকাল আর মরার মত পাষাণ হয়ে রবে!

* * *

দেববীর্য্যে দেবশৌর্য্যে দেশের সুসন্তান,
কে কে আছ স্বর্গরাজ্যে হও না আগুয়ান!

* * *

জাগ জাগ দেশের পুত্র পুণ্যবান্,
কি ফিরিঙ্গী ইঙ্গবঙ্গী যত মুসলমান!"

(—পংক্তি : ৬৮৯-৯০, ৬৯৯-৭০০, ৭০৯-১০)

উনিশ শতকের শেষার্ধের ভাওয়ালের সামন্ত-গোষ্ঠীর নিষ্ঠুর-নির্মম অত্যাচার-উৎপীড়নের এক ঐতিহাসিক দলিল 'মগের মুলুক' কাব্য এবং তৎকালীন ভূমি-নির্ভর বিদ্বৎসমাজের মেরুদণ্ডহীনতার মূক সাক্ষী গোবিন্দ দাসের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু। এই শতাব্দীর সমাপ্তি-কালের নিরন্ধ্র অন্ধকারময় পল্লী-জীবনে কবির একক সামন্ত-বিরোধী সংগ্রাম ছিল আলোকবর্তিকা-স্বরূপ। বিশ শতকের প্রতিবাদী গণসাহিত্য-রচনায় প্রেরণা দিয়েছিল উনিশ শতকের 'মগের মুলুক' কাব্য।

দশম অধ্যায়

'মগের মুল্লুক' কাব্য

[যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের অনুলিখিত]

বঙ্গদেশে আছে একটী স্বর্গপুর গ্রাম,
গাছ গাছড়ায় ভরা তাহা নবীন ঘন শ্যাম।
রাঙ্গামাটি পলাকাঠী খাঁটি সোনার মত,
টিলায় টিলায় ভুল হয়ে যায় মৈনাক শত শত।
উত্তরেতে রূপার রেখা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,
মন্দাকিনীর মত তাহার মন্দ মন্দ গতি।
দেবপুর নিবাসী কত দেবের দেহ ছাই,
মাখি বুকে মনের সুখে যখন সেথা যাই।
পূবের ধারে গাছের পাড়ে শ্যামল তপোবন,
চাঁপা বনে চাতক ডাকে চমকে উঠে মন।
কলসী কাঁকে আঁচল মুখে মেয়েগুলি আসে;
পাতা ঢাকা ফলের মত ফাঁপর হয়ে হাসে।
কেউ বা পড়ে কেউ বা ধরে উঠে ভিজা পায়,
পিছ্‌লা ঘাটে আছাড় খেয়ে কলসী ভেঙ্গে যায়
পূবের ধারে পথ ভরা বিলের সীমা নাই,
পিপি ডাকে কোড়া ডাকে কালেম্‌ কড়্‌গাই!
উত্তরেতে হাজার হাজার বিশাল গজার বন,
বাঘ ভালুকে বেড়ায় সুখে, খেলায় হরিণ গণ।
গাছে গাছে ময়ূর নাচে পেখম ধরে কত!
পুচ্ছে তার তুচ্ছ করে ইন্দ্রধনু শত।
বারমাসই ফুলের হাসি হয় না বাসি তায়,
ছায়া ঢাকা স্নেহমাখা মায়ের মতন প্রায়।

নানান্ ছন্দে নানান্ গন্ধে শীতল বায়ু বয়,
নন্দনে চন্দন বনে মলয় মনে লয় !
টিলার পাশে ঝরণা বহে ঢাল গড়ানে ভুঁই,
দুধ খাইতে মায়ের বুকে কাপড় ঠেলে থুই।
ফাল্গুন মাসে আগুন হাসে সারা কানন ভরা,
ধুঁয়ায় ধরায় দিক ছেয়ে যায় আকাশ আঁধার করা !
চৈত্র মাসে জোর বাতাসে উড়ে তুলারাশি,
পোড়া বনের পোড়া মনের শুষ্ক শ্বেত হাসি।

গ্রামের মাঝে রাজার বাড়ী ঘোড়া গাড়ী কত
ঠিক যেন সে রাবণ রাজার লঙ্কাপুরীর মত।
কিবা বাহার দক্ষিণে তার কোমল ঘাসের মাঠ,
মখমলের মছলন্দ পাতা বড় মানষি ঠাঁট।
উত্তরে তার বড় দালান ধবল গিরি প্রায়,
মাথার উপর ধবল আকাশ ঠেলে উঠতে চায়।
বর্ব্বরতার বিরাট্ ভবন ব্যভিচারের ঠাঁই,
ধর্ম্মনাশের কর্ম্মভূমি উহার মত নাই !
কোঠায় কোঠায় ভরা ইহার সতীর হাহাকার,
পালঙ্কে পালঙ্কে কত কলঙ্ক তাহার ! ৪০
গ্রামের ভিতর যোয়ান বৌ যাহার ঘরে রয়,
রাত আসিলে ভয়ে মরে কার বা কেড়ে লয় !
যমের মত আছে ক'টা রাজার সেপাইয়েরা,
দিনের বেলা খবর করে রেতে ভাঙ্গে বেড়া।
কিংবা যখন ঘরের ছেচে ফেন্ ফেলিতে যায়,
বাঘে যেমন গরু ধরে তেম্নি ধরে তায় !
মুখের ভিতর কাপড় ঠেসে দৌড়ে নিয়ে আসে,
এই দালানে একলা স্থানে ধর্ম্ম তাহার নাশে !
পাপের এটা পাহাড় খাড়া প্রেতের প্রিয়ভূমি,
কোন্ পাপে বা বক্ষে ধর স্বর্গপুর তুমি ! ৫০

পশ্চিমেতে বিশাল দীঘী নীল আরসীর মত,
কাল জলে আকাশ ডোবা মরাল ভাসে কত !
তীরে তীরে খেজুর গাছের কাঁঠাল গাছের সারি,
শানের বাঁধা ঘাট্‌লা শোভে পূবে রাজার বাড়ী ।
অন্দরেতে ফুলের বাগান বন্দরের প্রায়,
গন্ধ মধুর ব্যবসায় করে ভ্রমর বণিক তায় !
কাল জলে ঝরে তাহার কেলী কদম ফুল,
বৃন্দাবনের নিন্দা করে কালিন্দীর কূল ।
দিবানিশি খেলে জলে লহর শত শত,
ঠিক যেন সে বরুণরাণীর নীল আঁচলের মত ! ৬০
রাজার বাড়ীর মেয়ে ছেলে বাঁধা ঘাটে নায়,
সদ্য ফোটা ভাদ্র মাসের পদ্মফুলের প্রায় !
অন্য তীরে গৃহস্থ বৌ ঘোম্‌টা মাথায় দিয়ে,
ভিজাবাসে বাড়ী যায় কলসী কাঁকে নিয়ে ।
কিবা তাহার রূপের বাহার মরি মরি হায় !
লণ্ঠনের ভিতরে যেন আলোক দেখা যায় !
কোণাঘাটে সোনা বৌ কলসী ভাসে জলে,
মন ভাসে তার আরেক ঘাটে নিমগাছের তলে !
বামের দিকে দামের উপর বক রয়েছে খাড়া,
সন্ধ্যা করে বামনঠাকুর কোমর-জলে দাঁড়া । ৭০
দুজনেই চুপ করিয়ে মিটি মিটি চায়,
দুজনেরই ধর্ম্ম সমান কর্ম্ম সমান প্রায় !

পশ্চিমের পাড়ে রাজার ম্যানেজারের বাসা,
বেলবনে বকুল বনে কলাবনে ঠাসা !
বেড়ার উপর বেড়া তাতে দৃষ্টি নাহি চলে,
আছে একটি গুপ্ত পথ (সে) গভীর বনের তলে
সুন্দরের সুড়ঙ্গের মত আর এক মাথা তার ;
ম্যানেজারের মাথা মুণ্ড বল্‌ব কিবা আর ;

পশ্চিমেতে গৃহস্থ বাড়ী লাগিয়াছে গিয়া,
পূব দিকের পুকুর পাড়ের কাঁঠাল তলা দিয়া।
সে বাড়ীর বিধবা নারী সেই বিদ্যাবতী,
মৎস্য মাংসে একাদশী নিত্য করেন সতী।
কোমরে তার চাবির শিকল গলায় সোনার হার,
অঙ্গুরীটি "মনে রেখো" স্মরণ চিহ্ন কার!
নিশিমাখা বাঁকা দাঁত হাসে যখন তায়,
পাতিলের তলায় যেন আগুন লেগে যায়!
ম্যানেজারের চাকর একটি গয়লা ঘোষের পো,
খবর্দ্দারি কর্ত্তে গিয়ে নিজেও মারেন ছোঁ।

মালিনীর মালঞ্চখানি ম্যানেজারের বাসা,
সুন্দর সুরঙ্গ পথে করেন যাওয়া আসা!
নাহি দিবা নাহি রাত্রি সকাল সন্ধ্যাবেলা,
ইচ্ছামত করেন তারা রঙ্গরসের খেলা!
নাহি লজ্জা নাহি ভয় নাহি ধর্ম্ম বাধা,
রাজার উপরে রাজা সেজে নিজে গাধা!
বুদ্ধি মোটা সরু বোঁটা ছিঁড়ে গেছে তাই,
কাজে কাজেই এখন ওটা একেবারেই নাই।
ভাল কথা বলতে গেলে মন্দ বলে রাগে,
এমন একটা অন্ধ বলদ কুলুর গাছেই লাগে!
মায়ের কথা মেয়ের কথা স্ত্রীর কথা বিষ,
পরের কথায় ক্ষেপা কুকুর মত্ত অহর্নিশ! ১০০
নিজের নাইক বুদ্ধি শুদ্ধি পরের হাতে খায়,
পরের নাকে গন্ধ সোঁকে পরের চোখে চায়!
খসে গেছে চক্ষু কর্ণ জিহ্বা চরণ হাত,
কুড়ের যেন গুরু ঠাকুর পুরীর জগন্নাথ।
বোধোদয়ের পুত্তলিকা জড়ের চেয়ে জড়।
পরের কথায় রামছাগলটা নষ্ট কল্লে ঘর।

রাজার নাম 'গর্দ্দভেন্দ্র' মন্ত্রী 'অঙ্গারক',
দুজনারই নামের অর্থ কামেতে সার্থক !
দুজনারই রূপগুণ বুদ্ধি বিদ্যা যত,
রাজ্যশাসন প্রজাশাসন বল্‌ব ক্রমাগত ! ১১০
অত্যাচার অবিচার ব্যভিচারগুলি
একে একে যত কথা লিখব সাব খুলি !
ফাঁকে যাবে না অনুচর সহচরের দল,
কর্ম্মচারীর ষড়যন্ত্র চাতুরী কৌশল !

ওয়ারেণ্টর আসামী এক রাজার অনুচর,
ক'বার তারে পাঠায়েছে কলকাতা সহর।
টাকা দিয়ে ঢাকা দিবে সম্পাদকের মুখ ;
কে কোথা দেখেছ বল এমন আহাম্মুখ !
দু একজনা থাকে যদি টাকার পরবশ,
কিন্তু হেথা অনেকেরই আছে সৎসাহস ! ১২০
তাহাদের বাধ্য করা সহজ কথা নয় ;
তারা নহে জুগী জোলা অত ক্ষুদ্রাশয় !
লিখব এ রহস্য কথা নানান্ কথা আর,
ভুলব নাকো "ভেড়া বানান" "কনিক-সূত্র তার" !
গ্রামের মাঝে নানান্ দিকে সড়ক বেড়া কত,
ঠিক যেন কুণ্ডলিত শেষ নাগের মত !
পূবের দিকের সড়কটিই সবার চেয়ে সেরা,
দীপ্তিমন্ত ছায়াপথটি আকাশ যেন চেরা !
পূবে তাহার বামন বাড়ী দেওয়াল দেওয়া ঘর,
বড় মেয়ে ব্রজেশ্বরী জামাই দিগম্বর। ১৩০
রাজার মেয়ে প্রাণেশ্বরী স্বামীর সে যে পর,
স্বর্গপুরের অপদেবতা সবাই রাখে ভর !

বাড়ীর পূবে নূতন পুকুর জল থই থই করে,
পাড়ার লোকে যায় না তাতে রাজার তাড়ার ডরে।
তাহার উপর বনজঙ্গল আর এক উচ্চ টিলা,
ম্যালেরিয়ার রোগীর যেন পেট্‌টা ভরা পিলা!
পশ্চিমে তার ভেরন বেড়া বাগান শোভা পায়;
সন্ধ্যাবেলা ফুলের সনে মানুষ ফোটে তায়!
লাল টুক্‌টুক্ লাল টুক্‌টুক্ ঠোঁট দুখানি তার,
অপবিত্র পাপের উহা জলন্ত অঙ্গার! ১৪০
বডি জ্যাকেট্‌পরা মাখা অডিকোলন তায়,
গন্ধ পেয়ে ফুল ফেলিয়ে ফড়িঙ্গ পোকা ধায়!
বক্ষে নাই যে আঁচলখানি লক্ষ্য নাইক তার,
চক্ষে স্বধু লক্ষ লক্ষ কোনাকাটা ঠার!
সন্ধ্যাকালের মন্দ বায়ু উড়ায়ে নেয় চুল,
পাপের তরী পাইল পেয়েছে জোয়ার অনুকুল!
পদ্মমুখে মুচকি হাসি বাগান ভেসে যায়,
জাকাল গাছেব রূপটি বটে মাকাল গাছের প্রায়।
সর্ব্ব অঙ্গ ভরা তাহার গর্ব্ব অহঙ্কার;
রাজার বাতাস গায় লেগেছে রক্ষা নাইক আর! ১৫০
মনে মনে ভাবেন তিনি স্বর্গপুরের রাণী,
পদাঘাতে চূর্ণ করেন ভারতবর্ষখানি!
জজ মাজিষ্টর লাট বাহাদুর সবাই গোলাম তার,
তার হুকুমে সূর্য উঠে নইলে অন্ধকার!
বাস্তবিকই স্বর্গপুরের এমনি দশা হায়,
রাজা যেন তাহার হাতে বানর নাচেন প্রায়!
দক্ষিণে তার বাহির বাড়ী ঠাকুর ঘরের কাছে,
গাড়ী যাওয়ার হাতী যাওয়ার দিব্য সড়ক আছে!
দিবারাত্র যখন ইচ্ছা বুল হুইস্কি পিয়া,
হাতীতে আসেন নন্দদুলাল চুরুট মুখে দিয়া। ১৬০
বাঁশীর বদল বন্দুক হাতে চূড়ার বদল হেট্,
সখা তাহার শশী সিং আর হাতীর মাহুত মেট্!

হার্তী যখন পৌঁছে গিয়া বাহির আঙ্গিনা,
আগবাড়া সে বৃন্দাদূতী ব্রজেশ্বরীর মা!
বাড়ীর ভিতর সবাই খাড়া বউ ঝি বুড়ো ছেলে,
আদর যতন কচ্ছে যেন ইষ্টি ঠাকুর এলে!
এই খাতিরে নায়েবগিরি পেয়েছে বাপভাই,
লুটে খেলে দেশটা তারা হিসাব কিতাব নাই!
কে দেখেছে এমন পিশাচ এমন লক্ষ্মীছাড়া,
মেয়ে দিয়ে ভগ্নী দিয়ে ব্যবসায় করেন যারা। ১৭০
পচা গোবর পচা গু পচা নরক খেয়ে,
গুবরে পোকা গুয়ের পোকা ধন্য এদের চেয়ে!
ঝাটাখেকো পাঠার বংশ কল্লে কিবা কাজ,
স্বর্গপুরের এ কলঙ্ক লিখতে লাগে লাজ!
বাহির বাড়ী রাজার যখন হার্তী দেখে খাড়া,
শঙ্কা ভয়ে চারিদিকে চমকে উঠে পাড়া!
ঘরের ভিতর সবাই ঢোকে কেউ না ফিরে চায়,
শত কার্য্য নষ্ট হয় কি আগুন লেগে যায়!
বাঘ ভালুকও দেখলে অত কেউ না করে ডর,
পশুর চেয়ে পশু ওটা এম্নি ভয়ঙ্কর! ১৮০
দুষ্ট ছেলে ঘুম না গেলে ডেকে বলে মায়,
চোক বুজে থাক্ রাজার হার্তী ঐহ্ যে দেখা যায়।
কি দুর্ভাগ্য হতভাগ্য ব্রজেশ্বরীর পতি,
ভাবতে গেলে পাষাণ গলে তার সে দুর্গতি!
থাক্‌তে তাহার এমন নারী এমন রূপরাশি,
দুষ্ট রাহু চন্দ্র গিলে চকোর উপবাসী!
শ্বশুর বাড়ী আসতে সে যে দূরের কথা তার,
স্বর্গপুরে প্রবেশেরই নাইক অধিকার!
রাজার প্যাদা রাজার সেপাই রাজার মানুষ জন,
সীমান্তরে দেখতে পেলে করে আক্রমণ! ১৯০
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে ঘাড়ে বিদায় করে দেয়,
সাধ্য কি তার পূর্ণচন্দ্র আর যে ফিরে নেয়!

ধরিয়াছে এলোকেশী মাধব গিরির মত,
পাগল হয়ে দিগম্বর তাই কেঁদে বেড়ায় কত!
নাই কি দেশে এমন কেহ সাধু পুণ্যবান্?
কথা ছেড়ে কাজে করেন ভারত পরিত্রাণ?
কোথা রে ভাই দেশহিতৈষী সম্পাদকের দল!
বঙ্গবাসী ভলান্টিয়ার মুক্তিসেনাবল।
অনেক দূরে রুষ আফগান ভয় কি এখন তার,
থামাও আগে স্বর্গপুরের দারুণ অত্যাচার! ২০০
বাঁচাও আগে গরীব প্রজা প্রজার কুলমান,
জাতি গেল ধর্ম্ম গেল রক্ষা কর প্রাণ!

নষ্ট দুষ্ট ধূর্ত্ত ক্রূর বাজার ম্যানেজার,
সোনার লঙ্কা স্বর্গপুরী কল্লে ছারখার!
নাইক তাহার পাপ পুণ্য দয়া ধর্ম্ম জ্ঞান,
পুরাণ পাপী ব্রহ্মদৈত্যি বেজাত কেরেস্তান!
মদ মুর্গি নিত্য চলে পঞ্চ ম-কার সব,
দেখলে পরে পাঠা ছাড়া হয় না অনুভব!
নিরেট বোকা গদ্দভেন্দ্র বুঝতে নাহি পারে,
আচ্ছা করে মদ খাইয়ে বশ করিলে তারে। ২১০
ইয়ার দিল বেছে বেছে আপনা মানুষ জন,
এনে দিল মদের পিপা লাগুক যত মন!
বেশ্যা দিল ঘুষকি দিল আসর গেল যুটে,
আপনি এখন স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটে পুটে।

দল করেছে অঙ্গারক পাজি ক'জন মিলে,
দৈত্যাধম আর গড়ুর নেকো পোড়ামুখো হাড়গিলে!
ছাইমুখো আর দৈত্যদাস আর বিষ্ঠা খেকোর শেষ,
নষ্ট এই পাজি কয়টা উজার কল্লে দেশ!

বোকাচন্দ্র গর্দ্দভেন্দ্র বুঝায় তারে সবে,
আপনি যদি কার্য্য করবেন আমরা কেন তবে ? ২২০
লম্বা লম্বা মাইনে পাব বসে খাব ছি !
আপনি করবেন পরিশ্রম ত লোকে বলবে কি ?
এত বিভব, এত দৌলত, পেয়ে এত ধন,
খেটে মরলে এসব দিয়ে কোন্ বা প্রয়োজন ?
মজা করুন দিবানিশি লাগুক্ উপভোগে,
কেন বৃথা ভেবে মর্ব্বেন মিথ্যা গোলযোগে !
সুখের সময় যাচ্ছে বয়ে এইত সুখের দিন,
কলির মানুষ কদিন বাঁচে মজা করে নিন্ !
বোকা চন্দ্র ধোকা খেয়ে পড়ে গেছেন ফাঁদে,
আট্‌কে গেছে ব্যভিচার আর বিলাসিতার বাধে ! ২৩০
তাইতে করেন বদমায়েসী নানান্ দেশে ছুটে,
এদিকে তারা স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটে পুটে !

ছিল যারা হিতকারী প্রাচীন কর্ম্মচারী,
অঙ্গারকের ষড়যন্ত্রে তারা গেল হারি ।
কেউ বা আছে হতভম্বা সাক্ষীগোপাল হয়ে,
'এত' মত ডবল খাটনী পৃষ্ঠে বোঝা লয়ে ।
গুমরে মরে কোন কথা বলতে নারে ফুটে,
এদিকে তারা স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটে পুটে !
নিরেট বোকা গর্দ্দভেন্দ্র ব্যভিচারে মন,
নাহি শোনে প্রজার কান্না প্রজার আবেদন ! ২৪০
তবু যদি দুঃখী প্রজা তাহার কাছে যায়,
প্যাদা দিয়ে পাইক দিয়ে খেদায়ে দেয় তায় ।
অত্যাচারের উৎপীড়নে অঙ্গারকের দল,
টাকার লোভে স্বর্গপুরী দিচ্ছে রসাতল !
পথে পথে গরীব প্রজা কচ্ছে হাহাকার,
পাপিষ্ঠদের পাষাণমনে দয়া নাইক আর !

শিয়াল শকুন যতগুলা সকল গেছে জুটে,
শবের মত স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটে পুটে !
অঙ্গারকের শালার শালা তস্য শালা যারা,
রাজার বাড়ীর কর্ম্মচারী এখন সবে তারা। ২৫০
দেশীয়দের ন্যায্য দাবী গ্রাহ্য নহে আর,
তুঙ্গ দ্বীপের পঙ্গপালে কচ্ছে অধিকার।
তবীল ভেঙ্গে টাকা খেয়ে কেউ পলায়ে যায়,
বোকাচন্দ্র গর্দ্দভেন্দ্র নাহি জানেন তায়।
হাজার হাজার কাঁঠালগাছ আর গজার শত শত,
বছর বছর চোরের দলে নিয়ে যাচ্ছে কত !
রাজার নামে জোড় জুলুমে করে বেদখল,
নিজের নামে তালুক কিনছে জুয়াচোরের দল।
বনের জমা জলের জমা নজর জমা যত,
ভাগ করিয়ে বাটপারেরা খাচ্ছে অবিরত। ২৬০
গজমুর্খ গর্দ্দভেন্দ্র মদে মুহ্যমান,
হুস হইলে কেবল বোতল গেলাস আন্।
একটুক যদি দেরী হয় কি পানের খসে চুন,
খেঙ্গরামুখো খানসামাদের মেরে করে খুন।
কারে মারে এনে দিতে বুড়ার যোয়ান মাগ,
কে কোথা দেখেছ হেন আপ্তবল ছাগ !
বাস্তবিকই এটা যেন কুকুর কামাতুর,
সদা আছে কামে মত্ত পাপিষ্ঠ অসুর।
শীত গ্রীষ্মি নাইক তাহার এমনি বারমাস,
চোক তুলে না চেয়ে দেখে নিজের সর্ব্বনাশ। ২৭০
অন্য দেশে যেসবগুলির অন্ন নাহি জোটে,
তারাই এখন স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটে পুটে !

স্বর্গপুর শান্তিপুর অধিবাসী তার,
শিষ্ট শান্ত রাজভক্ত প্রজা তালুকদার

অংশীদার জমিদার আছে যত জন,
সত্যব্রত ধর্ম্মে রত উদার প্রাণ মন !
তাদের সঙ্গে দুষ্টমতি রাজার ম্যানেজার,
মিছামিছি মোকদ্দমা লাগায় অনিবার !
খাজনাখানা খালি কল্লে নানা মামলার ছলে,
মহাসাগর শুকিয়ে যায় ফুটা কল্লে তলে ! ২৮০
নিরেট বোকা গর্দ্দভেন্দ্র বিরাট বুদ্ধিমান,
দস্তখতি করেন শুধু চোখ তুলে না চান।
বড় মানুষ হয়ে গেল যত মজুর মুটে,
মজা করে স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটে পুটে !

অজচন্দ্র অঙ্গারকের বন্ধু অতিশয়,
জাল জালিয়াত জুয়াচোরের গুরু মহাশয়।
তারি নামে অঙ্গারক তার চুরির টাকা সব,
কর্জ্জ লাগায় রাজার কাছে রাজা কি গর্দ্দভ !
হাত বদলে নিজের টাকা নিজে করে ঋণ,
গাধার গাধা তস্য গাধা এমনি বুদ্ধিহীন ! ২৯০
মাথায় বুঝি মগজ নাইক কেবল ভরা গু,
পায়খানার গামলাটার মত বিষ্ঠাভরা থু !
জাল জালিয়াত চোর চোট্টা সকল গেছে জুটে,
সোনারপুরী স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটে পুটে !

গাধার গায়ে তাৎ লেগেছে মগের মুলুক পড়ে,
লেখকেরে মারতে চাহেন পথে ঘাটে ধরে।
বিনাদোষে কারে কারে ঘর জ্বালায়ে দিয়া,
স্বর্গপুর হতে চাহে দিতে খেদাইয়া !
খুলে দেখে পোষ্টাপিসে চিঠিপত্র যত,
পয়সা খেয়ে পোষ্ট মাষ্টার হচ্ছে অনুগত। ৩০০

কারো কারো চিঠিপত্র নষ্ট করে ফেলে,
সাবধান হে পোষ্ট মাষ্টার, যাবে কিন্তু জেলে !
কেহ কেহ পত্র নাহি লেখে রাজার ভয়ে,
চোরের মতন আছেন তাঁরা জড়সড় হয়ে।
এসব বুদ্ধি অঙ্গারকের, বেজায় বুদ্ধিমান,
কাপড় দিয়ে দীপ্ত আগুন ঢেকে রাখতে চান !
বেশী নাকি লজ্জা হয় তার জানলে দেশী লোকে,
কেটোর মত লম্বা গলা পেটের ভিতর ঢোকে !
দম্ভ করে স্বর্গপুরে হামবড়া পণ্ডিত,
খোঁয়াড় খুঁজলে এমনি চোয়াড় মিলবে কদাচিৎ। ৩১০
চন্দ্রনাথ আর বঙ্কিমচন্দ্র নবীন হেম অক্ষয়,
বলে বেড়ান তাহার কাছে সবাই পরাজয় !
এমন করে বুঝায়েছে গাধা বাজাটাকে,
কাজেই সেটা এ সকলকে তুচ্ছ করে থাকে।
এম্‌নি খোঁচা খোঁচাইব বুঝবে প্রাণে প্রাণে,
দেখাইব আর কেহ কি কলম ধরতে জানে।
মরণকালে ঘটে নাকি বুদ্ধি বিপরীত,
গৰ্দ্দভেন্দ্রের সেই দশা ঘটেছে নিশ্চিত !
তরুগ্রামে খুন করিয়ে সাহস গেছে বেড়ে,
তাইতে এখন বনমেড়াটা যারে তারে তেড়ে ! ৩২০
হাতী দিয়ে ঘর ভাঙ্গিয়ে ঘর জ্বালাইয়া দিয়া,
কত লোককে দেশ থেকে দিলে তাড়াইয়া !
নিরুদ্বেগে নিষ্কণ্টকে এত বুদ্ধি তাই,
জানে না যে শিমুল গাছে পোঁদ ঘষিতে নাই !
দে দেখিয়ে ঘর জ্বালায়ে সাধ্য যদি থাকে,
দেখব তোর ও বড় দালান কার বা বাপে রাখে।
ইট হইতে ইট খসাবে চূণ হইতে চূণ,
বৃটিশ রাজা রাখতে প্রজা এম্‌নি সুনিপুণ !
হাতে দিবে লোহার কড়া পায়ে দিবে বেড়ী,
কোথা রবে বুল হুইস্কি, কোথা রবে সেরী ৩৩০

যুড়ে দিবে ঘানিগাছে বলদ পঞ্চানন,
গাধা রাজার তেল বেচিবে পঁচিশ টাকা মণ!
ভরিছে তোর পাপের ভরা আর ত বাকী নাই,
এখন বাকী সোনার লঙ্কা পুড়ে হবে ছাই!
দিকে দিকে জ্বলছে আগুন সতীর অভিশাপ,
বজ্রনাদে গর্জ্জিছে তোর মাথার উপর পাপ!
কোটি মৃত্যু উৎপীড়িত প্রজার পাছে পাছে,
কোটি হস্ত ধর্তে তোরে হাত বাড়ায়ে আছে!
কোটি নরক রক্ত পুঁষে ভরছে কোটি গুণ,
ব্রজেশ্বরীর গর্ভে যেসব হত্যা কল্লি ভ্রূণ! ৩৪০
কোটি সর্পে উর্দ্ধে ফণা গর্জ্জে বলাৎকার,
রক্ষা নাইরে কলির মেড়া কলির কুলাঙ্গার'!

জ্ঞানবন্ত বুড়ো রাজা কর্ম্মে মতি স্থির,
রামের মত প্রজাপ্রিয় ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির!
দেশের হিতে প্রজার হিতে আকুল ছিল প্রাণ,
অকাতরে অর্থরাশি করিয়াছে দান!
কৃষিশিল্প ব্যবসায় আদি আসল যাহা কাজ,
তাহার তরে কত যত্ন কর্‌ত মহারাজ!
জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা দিত সমাজ সংস্কার,
কন্যাপণ, ভ্রূণহত্যা প্রজা বহুদার! ৩৫০
জলকষ্ট অন্নকষ্ট রোগের উৎপীড়ন,
অর্থব্যয়ে শরীর কষ্টে কর্‌ত নিবারণ।
ডাক্তারখানা স্কুল সভা পুকুর শত শত,
স্বর্গপুরে করেছিল সড়ক সেতু কত!
নিত্যযজ্ঞ অন্নকূট বিশাল অতিথ্‌শালা,
দেবদেশের কণ্ঠশোভা কীর্ত্তি-কুসুম মালা!
অবিভেদে অবারিত ছিল দয়া দান,
মাতৃ ভাষার ছিল তাহার যত্ন সুমহান!

অন্ন বস্ত্র পেত কত অনাথ পরিবার,
স্বর্গপুরের কল্পতরু নাই সে এখন আর ! ৩৬০
কুটবুদ্ধি ধূর্ত্ত বেটা মন্ত্রী ভয়ঙ্কর,
পাপ পুণ্য জ্ঞানশূন্য যমের অনুচর ;
বুড়ো রাজায় বিষ খাওয়ায়ে কল্লে তারে হত,
সেসব তত্ত্ব গোপন সত্য লিখব ক্রমাগত।
আপনি এখন স্বর্গপুরের রাজা মহারাজ,
শত হস্তে স্বর্গরাজ্য লুটে নিচ্ছে আজ !
গজভুক্ত কপিত্থ বা শোথ রোগীর প্রায়,
ভেড়াকান্ত গর্দ্দভেন্দ্র সর্ব্বস্বান্ত হায় !

স্বর্গপুরে ছিল আগে উচ্চ বিদ্যালয়,
খেতে পেত পরতে পেত ছাত্র সমুদয়। ৩৭০
হারামজাদা অঙ্গারক সে স্বর্গপুরে গিয়া,
মূলশুদ্ধ বিদ্যালয়টী দিচ্ছে উঠাইয়া !
নাইক এখন পাঠশালাটী ক খ শিখতে ঠাঁই,
ছেলে পিলের তরে কাঁদে দেশের লোকে তাই !
লেখা পড়া শিখলে লোকের চোখ ফুটিয়ে যাবে,
অবিচারের অত্যাচারের দোষ ধর্ত্তে চাবে।
পারবে নাকো করিবারে যখন খুশী যা,
জোর জুলুমে চাঁদা মাথট আদায় হবে না !
রাজোপাধি মেয়ের বিয়া বাই খেমটা নাচে,
জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লোকের শিকার খানা আছে। ৩৮০
হবে নাকো আদায়েতে নানান্ আবুয়াব,
পাবলিক ওয়ার্ক রোড্ সেসে দেড়া দুনা লাভ।
হাতী দিয়ে ঘর ভাঙ্গিয়ে ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া,
জোর জুলুমে পরের তালুক দখল করে নেওয়া !
ধোপা নাপিত বন্ধ করা সভা সমাজ আর,
কয়েদ করে জরিমানা আদায় হবে ভার !

কঠিন হবে স্বেচ্ছাচার ইচ্ছা পূরাইতে,
প্রজার ঘরে নিত্য নূতন বৌ ঝি কেড়ে নিতে!
বুঝতে পেলে আপন স্বত্ব আপন সাহস বল,
ভেঙ্গে দিবে বদমায়েসী বঞ্চনা কৌশল! ৩৯০
ফুঁয়ে ছিঁড়ে যাবে তখন কোথায় কণিক সুতা,
পোড়ামুখে মারবে উহার পটাস্ পটাস্ জুতা!
এই ভয়ে অঙ্গারক সে স্কুল উঠায়ে দিছে,
সঙ্গে সঙ্গে আরেক ভয় দূর হয়ে গেছে।
মাষ্টার পণ্ডিত শিক্ষিত লোক থাকলে দেবদেশে,
গর্দ্দভেন্দ্র যদি গিয়া তাদের সঙ্গে মিশে!
ভয় ছিল তার মনে মনে তারা দিবে খুলি,
ভেদা মুখো বনবলদের চক্ষে বাঁধা ঠুলি।
চোখ থাকিলে মুখের গরাস কেড়ে নেওয়া ভার,
তাই করেছে স্বর্গপুরে দারুণ অন্ধকার! ৪০০

কৃষিশিল্প বাণিজ্যাদি প্রজাহিতের তরে,
স্বর্গপুরে বুড়ো রাজ যত্নে সভা করে।
ব্যয় করিত তাতে কত অর্থ রাশি রাশি,
অঙ্গারক তা তুলে দিল স্বর্গপুরে আসি।
কল্লে বেটা আরেক সভা কুশলকারী নাম,
কৌশল করে সিদ্ধ কল্লে নিজের মনস্কাম।
নিজের দেশের কুটুম যাদের জলকষ্ট ছিল,
হাজার কয়েক টাকা নিয়ে পুকুর কেটে দিল।
স্বর্গপুরের ভিটায় পুকুর নাই হস্ত গাধা,
জলকষ্টে প্রজা মরে মন্ত্রী হারামজাদা! ৪১০
নাই সে এখন কৌশল করা কুশলকারী আর,
স্বার্থসিদ্ধি হয়ে গেছে দরকার কি তার?

পরিস্কৃত সড়কগুলি লোহাব কাঁকর ঢালা,
স্বর্গপুরের কণ্ঠে ছিল মরকতের মালা !
সাদা সাদা সেতুগুলি দেখা যেত হায়,
মধ্য মণি মুক্তা যেন যুক্ত ছিল তায়।
নাই সে এখন বাহার তাহার বনজঙ্গলে ঢাকা,
বর্ষাকালেব বির্তিকিচ্ছি দারুণ কাদামাখা !
কত জা'গা ভেঙ্গে গেছে নাই সে শোভা আর,
যত্ন বিনা ছিন্ন তাহা বত্ন মণিহাব ! ৪২০
যাদেব বাড়ী দেখতে ভাল নূতন বৌ ঝি আছে,
কুটনী না ঘেসিতে পারে যাদের বাড়ীব কাছে,
তাদের বাড়ীব ঘরের ছেচে কোণায় পেছন দিয়ে,
বিনাকাজে নূতন সড়ক নিচ্ছে বাঁধাইয়ে।
হাতী চড়ে দেখবে গাধা হারামজাদার আব,
ভদ্রলোকেব শুদ্ধ ঘরের শুদ্ধ পরিবার।
আঁখিব ঠারে যদি পারে ধর্ত্তে তারে হায়,
পাহাব ভেঙ্গে মণি নিবে এমনি অভিপ্রায় !
দুষ্টবুদ্ধি অঙ্গারক সে পাজির বাহাদুর,
দৈত্য দানব হতে অতি অত্যাচারী ক্রূর। ৪৩০
তিন শো গাঁয়েব রায়তগুলি ছিন্ন ভিন্ন করি,
অন্নাভাবে মরিছে সবে হরি হরি হরি !
জমার জমি নাইকো কারো প্রজাব হাহারব,
যাদের জমি তাদেব কাছে বর্গা দিবে সব !
অধিক ফসল উসল করে কুশল চোরের দল,
ভাগ করিয়ে যাচ্ছে নিয়ে চাষাব আশার ফল!
গজমূর্খ বাজাও না খাজনা তাহার পায়,
চোক বুঝিয়ে অন্ধ বলদ সজ্‌না খাড়া খায় !
স্বর্গপুরে বঙ্গভাষার কর্ত্তে আলোচনা,
বিজ্ঞাপনে সভা আছে কার্য্যেতে কল্পনা। ৪৪০
জন্মে কভু হয় নাইক অধিবেশন তার,
সভ্য বলে নাম দিয়েছে অনেক মহাত্মার।

ইহা কেবল দুষ্ট ফন্দি অভিসন্ধি ভরা,
গাধার মাথায় হাত বুলায়ে টাকা চুরি করা।
খরচ লিখে হাজার টাকা অমুক গ্রন্থকার,
অমুক গ্রন্থ খরিদ হ'ল হাজার কপি তার।
এক শো টাকার বই কিনিয়ে নয় শো টাকা নিল,
পঁচিশ টাকার পুরস্কারে এক শো টাকা দিল!
কোন গ্রন্থকারের সঙ্গে চুক্তি করে নেয়,
দশটি হাজাব খরচ লিখে দুইটি হাজার দেয়! ৮৫০
চোক তুলে না চেয়ে দেখে গণ্ডমূর্খ গাধা,
রাজাব ভাণ্ডার লুটে নিল মন্ত্রী হাবামজাদা!

বঙ্গদেশে অঙ্গাবকের নাইক যুড়ি মিল,
আত্মীয় পত্রিকা লিখে লেখক চিন্তাশীল!
কবিতা প্রসঙ্গ আদি সমালোচন আর,
রঙ্গরসে উপন্যাসে অঙ্গভরা তার।
আলোচনা করবে এতে উক্ত সভার বই,
চারি ছত্রে বিজ্ঞাপন তাব মুখপত্র হই!
এই ফাঁকিতে এক শো টাকা মাসিক খরচ নিলে,
অথচ তায় একটী মাত্র আলোচনা দিলে! ৪৬০
সেটি কিন্তু আত্মীয়ের আপনা আলোচনা,
কুলুর গাছের অন্ধ বলদ বুঝতে পেল না!
তাতে আবাব বছর দুইয়ে দুই এক সংখ্যা তার,
বার করিয়া ধূম্রকেতুর লাঙ্গুল অবতার;
গাধাব চক্ষে বুলাইয়া এম্‌নি ধাঁধাঁ দেয়,
বার মাসের সকল টাকা উসল করে নেয়!
খাজনা খানায় হারামজাদা ডবল খাতা রাখে,
মিথ্যা কথা বুঝায় তাতে গাধা রাজাটাকে।
পাঁচ হাজারে পঁচিশ হাজার খরচ লিখে নেয়,
চৌদ্দ বছর হয়ে গেল নিকাশ নাহি দেয়! ৪৭০

গজমূর্খ গর্দ্দভেন্দ্র বুঝতে পারে ছাই,
এগ্রিমেণ্ট্ লিখে দিচ্ছে নিকাশ দাবী নাই !
এমন ছাগল এমন পাগল কোথা আছে আর,
ধন্য ধন্য বুদ্ধিটা ঐ বন্য বলদটার !!

বদের হাঁড়ি চালাক ভারী দুষ্ট ম্যানেজার,
বদনামী ঢাকিতে দেখ ফন্দি কেমন তার !
খোস্‌নামী লেখায়ে বেটা আপনা মানুষ দিয়া,
পত্রিকাতে মিথ্যা কথা দিচ্ছে ছাপাইয়া !
টাকা দিয়া কচ্ছে আবার কারে কারে বশ,
লিখছে তারা অঙ্গারক আর গাধার কত যশ ! ৪৮০
স্বর্গপুরে যারা আসল গুহ্য কথা জানে,
তুচ্ছ করে তারা ওসব নাহি তুলে কানে !
ঘুস খাইয়া ছাপায় এসব সম্পাদক যারা,
পশু বলে তাদিগকে নিন্দা করে তারা !
শিয়াল কুকুর হতে ভাবে ক্ষুদ্র নীচাশয়,
দেশের শত্রু জাতির শত্রু সমাজ করে ক্ষয় !
পাপের করে সহায়তা পাপীর বাড়ায় বল,
ধর্ম্মনাশা কর্ম্ম ওদের ধরায় অমঙ্গল !

চক্ষু টেরা কার্য্যে মেড়া বুদ্ধি বিপরীত,
স্বর্গপুরে ছিলেন আগে মগাই পণ্ডিত। ৪৯০
ভাগ্যদোষে হতভাগ্যের কুবুদ্ধি ঘটিল,
গাধাটাকে বুদ্ধি দিয়া অঙ্গারকে নিল !
দুষ্ট অঙ্গারক কিন্তু স্বর্গপুরে গিয়া,
তারেই আগে তাড়াইল রম্ভা মুখে দিয়া।
পাণ্ডাহীন পণ্ডিতটার নাইক মানামান,
ঘৃণা পিত্তি নাইক কিছু অশ্বঅস্তজ্ঞান।

আবার এখন অঙ্গারকের চরণ লেহন করে,
ভিক্ষা মেগে নিচ্ছে ছেলের উপনয়ন তরে।
প্রকৃতিতে লিখছে পত্র প্রমাণ দিতে তাই,
অঙ্গারক আর গাধার মত বঙ্গদেশে নাই। ৫০০
গর্দ্দভেন্দ্র অতিবুদ্ধি বিচার বিলক্ষণ,
প্রমাণ—বেছে আনছে এখন চোরা মন্ত্রীগণ!
গর্দ্দভেন্দ্র স্থিরমতি বুদ্ধি অচঞ্চল,
প্রমাণ—জেনে জবাব দেয় না জুয়াচোরের দল।
গর্দ্দভেন্দ্র অতিসূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান,
প্রমাণ—সাম্‌নে চুরি করে দেখতে নাহি পান।
গর্দ্দভেন্দ্র কার্য্য দক্ষ কার্য্য পটু ভারি,
প্রমাণ—নিজে নাহি দেখে নিজের জমিদারী।
গর্দ্দভেন্দ্র সুবিচারী প্রজার প্রিয় অতি,
প্রমাণ—তাদের গৃহ জ্বালায় হরে কুলবতী! ৫১০
গর্দ্দভেন্দ্র ধর্ম্মবন্ত সাধু সদাশয়,
প্রমাণ—পঞ্চ ম-কার বিনা মুহূর্ত্ত না রয়!
গর্দ্দভেন্দ্র দাতা লোকে নিন্দা করে মিছে,
প্রমাণ—প্রতিবাদ লিখতে পাঁচ শো টাকা দিচ্ছে!
কারে দিচ্ছে টাকার তোড়া লিখতে ইতিহাস,
নিজের খ্যাতি লিখবে তাতে আসল অভিলাষ।
বদ্‌নামীতে দেশ ছেয়েছে মুখ দেখানি দায়,
তাইতে বিড়াল মাটি দিয়া গু ঢাকিতে চায়!
পায়খানাতে আতর মাখলে পবিত্র না হয়,
নামাবলী গায় দিলে চোর তো সাধু নয়! ৫২০
শুদ্ধ হয় না কুকুর যদি গঙ্গাজলে নায়,
আজন্ম যে এঁটো কাঁটা শুক্‌না বিষ্ঠা খায়।
শূকর হয় না সন্ন্যাসী তো কুশের গোড়া খেলে,
বানর হয় না ভোলা মহেশ বিল্বতলে গেলে!
হবিষ্যান্ন খেলে বেশ্যা সাধ্বী সতী নয়,
চন্দনে মাখিলে নোড়া শালগ্রাম না হয়!

গিণ্টি কল্লে টিনের উপর যেমন থাকে টিন,
তেম্‌নি গাধা হারামজাদা আছে চিরদিন।
টাকা দিয়ে কেবল ওরা কীর্ত্তি কিনতে চায়,
ভাড়া দিয়ে লোক রাখিয়ে খোস্‌নামী গাওয়ায়! ৫৩০
এদের যদি জীবনচরিত লিখতে কেহ চাও,
ছদ্মবেশে আগে তবে স্বর্গপুরে যাও!
সঙ্গে নিয়ো মগের মুলুক দেখো মিলাইয়া,
প্রতি ছত্র প্রতি শব্দ প্রতি অক্ষর দিয়া।
একটি চুলও ফাঁক যাবে না মিলবে অবিকল,
গজমূর্খ গর্দ্দভেন্দ্র অঙ্গারকের দল।
কিন্তু যদি ঘুস খাইয়ে বেহুঁস্ হয়ে যাবে,
ভদ্রলোকের কাছে তবে উচিত শিক্ষা পাবে!

অঙ্গারকের জামাই একটা নীলের দোসর,
বিষ্ঠাখেকোর গুষ্ঠি সেটা মর্কটপাড়া ঘর। ৫৪০
পাগড়িপরা পরামাণিক সিংহনগর থাকে,
দিনের বেলায় বটতলাতে ফিরে পাকে পাকে।
কার্য্যে বোটা অষ্টরম্ভা হতভম্বা অতি,
পায় ধরিয়া সঙ্গে থাকে ঢাকের বাঁয়ার গতি!
গাধার আনছে সুপারিস্ যাহার তাহার কাছে,
কারো বাড়ীতে চুল দাড়ি কি বৃদ্ধি হয়ে আছে।
নূতন নাপিত যশোব্যাপিত সবাই জানে যে,
বঙ্গদেশী চিন্তাশীলের জামাই বটে এ!
কিন্তু বেটার ভাগ্যদোষে অজ্ঞ জেলাবাসী,
যোগ্য জেনে কেউ কোনদিন ক্ষৌর হয় না আসি। ৫৫০
বিনা কাজে বানর কভু স্থির থাকিতে নারে,
তাইতে নানা বদমায়েসী চাহে খেলিবারে!
উকিল দেখলে বলে যদি প্রকৃতিটা ছাড়,
গাধার উকিল করব টাকা যত নিতে পার।

মগের মুলুক লেখে যে তার নিন্দা করা চাই,
টাউন্ হলে বক্তৃতা দিবে গাধার তুল্য নাই।
মোক্তারকে অঙ্গারকের মোক্তারনামা দিয়া,
বেল্লিকি বক্তৃতা করে বটতলাতে গিয়া!
ডাক্তারকে বলে যদি দেবধাম না যাও,
গাধার বাড়ীর ডাকার দেখো কেমন টাকা পাও! ৫৬০
শ্বশুর আমার গর্দ্দভেন্দ্রের মন্ত্রী জাম্বুবান,
দিতে পারেন তিনি যারে দিতে যাহা চান!
গাধাটা তো সাক্ষীগোপাল কোন শক্তি নাই,
কেউ না বোঝে ওটা আসল ষাঁড় কি বলদ গাই?
নীল বানরের বুদ্ধি দেখে লোকে হেসে মরে,
তবু বানর পাড়ায় পাড়ায় কিচির মিচির করে!
সিংহনগর হতে দূরে নহে স্বরগপুর,
সবাই চিনে গর্দ্দভেন্দ্র রাজা বাহাদুর!
অঙ্গারমুখো অঙ্গারককে সকল লোকেই চিনে,
বুদ্ধিকৃশ বনবৃষ গর্দ্দভেন্দ্র বিনে। ৫৭০

স্বর্গপুরের কুপুত্র এক পিশাচ দৈত্যাধম,
মাতৃঘাতী ভ্রাতৃদ্রোহী প্রেতের নহে কম!
স্বর্গপুরের পশ্চিমে তার চন্দ্রনগর বাড়ী,
হারামজাদা অঙ্গারকের প্রধান সহকারী!
জাতির শত্রু জাতির শত্রু সবার শত্রু সেই,
জন্মভূমির মহাশত্রু তাহার তুল্য নেই!
পাজি বানর অঙ্গারকের সঙ্গে গিয়া মিলে,
আপনা ঘরে হতভাগা আপনি আগুন দিলে!
আপনা হাতে পল্লে মূর্খ আপনা গলে ফাঁস,
আপনা হাতে কল্লে পাজি আপনা সর্ব্বনাশ! ৫৮০
এই তো বেশী দুষ্টবুদ্ধি বদমায়েসের গোড়া,
ওর কপালে নাগড়া জুতা ভাঙ্গছে পঁচিশ জোড়া!

নিত্য নিত্য স্বর্গরাজ্যের অধিবাসিগণ,
গৃহভেদী বংশনাশা ভীষণ বিভীষণ !
ওই শিখায়ে মন্দ ফন্দী, ওই শিখায়ে কল,
টাকার লোভে স্বর্গরাজ্য পুড়ছে অবিরল !
গরীব প্রজা নীরব হয়ে কাঁদছে ঘরে ঘরে,
গোষ্টির উহার কোষ্টি খুলব আরেক হপ্তা পরে !

অঙ্গারকের মেয়ে একটা ডাগর ডাগর চোখ,
চাইলে পরে তাহার পানে সবাই গিলে ঢোক ! ৫৯০
আধা খোলা আধা আগ্‌লা চুলের আগে বাঁধ,
বৈশাখের মেঘ জড়ানো একাদশীর চাঁদ !
কখনো বা খসে গিয়ে ফুর্‌ফুরায়ে উড়ে,
রাহু যেন বাহু তুলে মুখের কাছে ঘুরে !
এই থাকে তার মাথার কাপড় এই টেনে নেয়,
শারদ মেঘে আত্‌কা যেমন চাঁদ খুলিয়ে দেয় !
চাউনী তাহার বাউনী পেলে বাড়ী ছেড়ে যায়,
শূণ্যলতা আলগা যথা গাছের আগে ধায় !
কত কথা বলে কপট কুটিল কাল ঠার,
টেলিগ্রাফের আফিস যেন চক্ষু দুইটি তার ! ৬০০
দাড়িমফাটা মুচকি হাসি ঠোটে আছে লেগে,
আপনি বিলায় যারে তারে নিতে হয় না মেগে !
গালভরা তার গোলাপ গাঁদা মুখভরা তার মধু,
বুকভরা তার বদান্যতা ঠাঁই পায় না বঁধু !
বোপদেবের মুগ্ধবোধ উপদেবতার তরে,
সাগর পানা ডাগর চোখে নাগর টাকা পরে !
গর্দ্দভেন্দ্র যায় যখন সে অঙ্গারকের বাসে,
মেয়ে নিয়ে পত্নী নিয়ে নিজে তখন আসে !
কিবা বাহার শোভা তাহার মুনির মন ভোলে,
বসন্ত যেন বসেন এসে ফুলের দোকান খুলে ! ৬১০

কেউ মালতী কেউ সেউতী কেউ বা যূথীফুল,
কেউ বা ফোটা কেউ ঘোম্‌টা কেউ নব মুকুল !
দেখলে এমন ফুলের বাজার গাধা রাজার থাক,
মদন রাজার তাকে পড়ে, সবার লাগে তাক্‌ !
কিবা তাদের কথার ভঙ্গী, কিবা তাদের ভাব,
গর্দ্দভেন্দ্র মনে করেন উপরি এটা লাভ !
মেয়েগুলি কখন কখন এদিক ওদিক চায়,
ফাল্গুন মাসে নীল আকাশে উল্কালতার প্রায় !
দুচার কথা কয়ে মন্ত্রী আপনি দূরে ভাগে,
গাধার গায়ে তখন ধীরে ফুলের বাতাস লাগে ! ৬২০

রূপার বাটায় ছাঁচি পানের আতরমাখা খিলি,
দুই বোনেতে ঝগড়া করে তুই কেন লো দিলি ?
গাধা রাজার হাতে তুলে সবাই দিতে চায়,
গাধা চাহে রাজ্যটা দেয় ঢেলে ওদের পায় !
কপট রাগে ফেলতে বাগে কেউ বা করে মান,
ঝড় লেগে লড়ছে যেন রসের সরাখান !

ধীরে ধীরে মন্ত্রী নিয়ে ষড়যন্ত্র করে,
কে ডাকিল বলে পড়ে অন্য ঘরে সরে !
লজ্জা গেল লজ্জা পেয়ে পাছে পাছে তার,
পরিবর্ত্তে বোতল গেলাস আস্‌ল দুজনার ! ৬৩০
মুখ ঢাকিল মলিন রবি অস্তাচলে পশি,
হারামজাদার ঘরে গাধার মদন চতুর্দ্দশী !

কেবা কুত্র বণিকস্মূত্র দেখছ এমন ভাই,
পুরীষ মূত্র অঙ্গারকের বিষয় বোধ নাই !

মেয়ে দিয়ে গাধাটাকে কচ্ছে কেমন বশ,
চার দণ্ডে আদায় করে চৌদ্দ হাজার দশ!
গাধা ভাবে স্পর্শমাত্র পূর্ণ মনস্কাম,
স্বর্গরাজ্য নহে ইহার এক মিনিটের দাম!
অতি ক্ষুদ্র একটা রাজ্য লুটে পুটে নেয়,
শত স্বর্গ অঙ্গারক তো হাতে হাতে দেয়! ৬৪০
ছদ্মবেশী হৃদ্দ পাজী বিষম নচ্ছার,
বেহায়া বেল্লিক বেটা ভণ্ড ম্যানেজার!
বদমায়েস বজ্জাত ধূর্ত্ত দারুণ লঙ্কাপোড়া,
বকের মত ঠকের ধর্ম্ম দুষ্ট নারী চোরা!
মায়ের শ্রাদ্ধে শতে শতে দধি ক্ষীর নিল,
একটা পয়সা গোয়ালাদের মূল্য নাহি দিল!
স্বর্গ নরক কোথায় গেল অঙ্গারকের মা,
অনেক ভেবে দেশের লোকে বুঝতে পেল না!
বাস্তবিকই পাজী কেবল কামের দ্বারের ষাঁড়,
নাই তার অসাধ্য কিছু এমনি জানোয়ার! ৬৫০
· বিনে ভাব যোটে না চিন্তা নাহি ফুটে,
—বাতাস নইলে ভাষার তরঙ্গ নাহি উঠে!
ভাবের গলে জোয়ার আসে মাগী-আঁখি ঠারে,
মাগীর গন্ধে অন্ধ পাঁঠা মত্ত একেবারে!
মাগীর জন্য চিন্তাশীলের সদা চিন্তা তাই,
আত্মীয় পত্রিকা লিখবে নূতন মাগী চাই!
কুটনী আছে মাইনে করা মাগীর যোগান দেয়,
ছল করিয়ে বল করিয়ে বৌ ঝি কেড়ে নেয়!
রাজা নাহি নালিশ শোনে গণ্ডমূর্খ গাধা,
ষণ্ডামিতে দেশ নাশিল মন্ত্রী হারামজাদা! ৬৬০
বাসার কাছের মাগী কেবল অসময়ের সাথী,
শরীর ফুলা ধুলা তোলা বরুম দেশী হাতী!
মিছে তারে বয়ে মরে সদা সর্ব্বক্ষণ,
বিলাতি ঢাকের মত বাজায় আরেক জন!

ব্যভিচারের বিতিকিচ্ছি বিশাল মহাঝড়ে,
স্বর্গপুরে স্বর্গ নরক উথল পাথল করে !

মগের মুলুক পড়ে গাধার জেদ গিয়েছে বেড়ে,
আবার নাকি বৌ ঝি পাড়ার আনছে কেড়ে কেড়ে !
হাতীর উপর হস্তীমূর্খ যদি দেখা দিন,
জোড় হাত পড়ে পাড়ায় ঐ নিন নিন্ ! ৬৭০
দৌড়ে সবে ঘরে উঠে কাপড় চোপড় ফেলে,
পাগলা শিয়াল পাগলা কুকুর দেখতে যেমন পেলে !
সর্ব্বদাই শশব্যস্ত স্বর্গপুরবাসী,
ভেবে মরে কার বা ঘরে কখন ঢোকে আসি !
যোয়ান মেয়ে যোয়ান বৌ সবার গলগ্রহ,
অমৃতকে বিষ ভাবিয়া কোথায় থাকে কেহ !
যাহার ঘরে ফোটে যখন রূপের পদ্মফুল,
বুকের রক্ত শুকায় তাহার মাথার কাঁপে চুল !
স্বর্গপুরে ভিন্ন দেশী কুটুম্বদের নারী,
বিয়া সাদী হ'লে দেয় না আসতে কারো বাড়ী ! ৬৮০
ইহার চেয়ে লজ্জা কিবা স্বর্গপুরে আর,
মরণ নাই কি সে জঘন্য বন্য বলদটার !
পুণ্যভূমি জন্মভূমি গেল অধঃপাতে,
গঙ্গা পূজার ধলা পাঁঠা অঙ্গারকের হাতে !
স্বর্গপুরে অনেক ঘরে মানের গোড়ে ছাই,
অসুরগুলির হাতে পড়ে কুসুম কারো নাই !
দেবত্ব দূরের কথা মনুষ্যত্বহীন,
স্বর্গরাজ্যের দেবতাগুলি হচ্ছে দীনের দীন !
জাগ স্বর্গরাজ্যবাসী জাগ জাগ সবে,
কতকাল আর মরার মত পাষাণ হয়ে রবে ! ৬৯০
জাতি গেল ধর্ম্ম গেল গেল তালুকদারী,
অন্য দেশী বন্য ব'লে দিচ্ছে টিট্‌কারী !

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য কর্তৃক অনুলিখিত 'মগের মুলুক' পুস্তিকার একটি পৃষ্ঠা।

চৌদ্দ বছর পাপীষ্টদের লাথি ঝাঁটা খেলে,
সতীত্ব হারাল কত কুলের মেয়ে ছেলে !
পিতৃ পিতামহের নাম ডুবল সবাকার,
দেবকুলে কালি দিল কুল কুলাঙ্গার !
ইজ্জত হুর্ম্মত হীন সব কড়ার কিম্মত নাই,
কালমুখ কাপুরুষদের মুখে পড়ুক ছাই !
দেববীর্য্যে দেবশৌর্য্যে দেশের সুসন্তান, ৭০০
কে কে আছ স্বর্গরাজ্যে হও না আগুয়ান !
দেখ না কি জন্মভূমির কি দুর্দ্দশা হায়,
কত মাতা কত ভগ্নী পাপে ভেসে যায় !
সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছে কত অনাথ পরিবার,
হারায়ে মাটি কান্নাকাটি কচ্ছে তালুকদার !
কোমল কাঁচা কুলের বাছা তাড়ায় দেশ থেকে,
পতিকে দেয় পাগল করে পত্নী কেড়ে রাখে !
ঘর বাড়ী পোড়ায়ে কেহ হনুমানের দল,
নাইক শঙ্কা সোনার লঙ্কা লুটছে অবিরল !
জাগ জাগ দেবদেশের পুত্র পুণ্যবান্,
কি ফিরিঙ্গী ইঙ্গ বঙ্গী যত মুসলমান ! ৭১০
চেয়ে দেখ চারিদিকে কোন্ দেশে বা আর,
এত প্রজা উৎপীড়ন এত অত্যাচার !
হারায়ে সতীত্ব রত্ন কাঁদছে কোথা নারী,
অভাগী জননী যারা তোমারি তোমারি !

'মগের মুলুক'-এর পাঠান্তর

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের অনুলিখিত 'মগের মুলুক' পুস্তিকায় রয়েছে ৭১৪টি পংক্তি। কিন্তু সুধীররঞ্জন চক্রবর্তীর নকলীকৃত পুস্তিকায় ৬৬৪টি পংক্তি রয়েছে এবং এই পংক্তিগুলির মধ্যে এমন ৪৪টি পংক্তি রয়েছে, যা যতীন্দ্রপ্রসাদের অনুলিখিত পুস্তিকায় নেই। যতীন্দ্রপ্রসাদের পুস্তিকার ৬২০টি পংক্তি সুধীররঞ্জনের পুস্তিকায় রয়েছে অর্থাৎ যতীন্দ্রপ্রসাদের ৯৪টি পংক্তি শ্রীচক্রবর্তীর পুস্তিকায় পরিত্যক্ত হয়েছে এবং নতুন ৪৪টি পংক্তি সংযোজিত হয়েছে। উপরন্তু, সুধীররঞ্জনের অনুলেখনকালে এমন বহু শব্দ ও পংক্তির রূপান্তর ঘটেছে, যেগুলি যতীন্দ্রপ্রসাদের পুস্তিকায় নেই কিংবা অন্য রূপে রয়েছে। পাঠকদের সুবিধার্থে নিম্নে বন্ধনীভুক্ত পংক্তি সংখ্যা সহ শব্দের রূপান্তর, পংক্তির পরিবর্তন, সংযোজন ও বর্জন উপস্থিত করা হল। তবে সুধীররঞ্জনের নকলীকৃত কোনো কোনো পংক্তির শেষ শব্দটি কীটদষ্ট হওয়ায় শব্দগুলির রূপান্তর ঘটেছিল কিনা সে-সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

(ক) শব্দের রূপান্তর

যতীন্দ্রপ্রসাদের অনুলেখনে	সুধীররঞ্জনের অনুলেখনে
গাছড়ায় (২)	গাছলায় (২)
গাছের (৯)	গাঙ্গের (৯)
মুখে (১১)	বুকে (১১)
পথ (১৫)	পদ্ম (১৫)
কড়্গাই (১৬)	কত গাই (১৬)
তার (২০)	তাহার (২০)
মতন (২২)	মত (২২)
বনে (২৪)	বলে (২৪)
গড়ানে (২৫)	গড়ান (২৫)
দুধ খাইতে (২৬)	দুগ্ধ খেতে (২৬)

ধুয়ায় ধরায় (২৮)	ধুলায় ধুলায় (২৮)
মছলন্দ (৩৪)	মচন্দনের (৩৪)
গিরি (৩৫)	গিরির (২৫)
ধবল (৩৬)	বিশাল (৩৬)
ইহার (৩৯)	তাহার (৩৯)
বেলা, রেতে (৪৪)	বেলায়, রাতে (৪৪)
পাপে বা, স্বর্গপুর (৫০)	পাপেরা, "স্বর্গপুরী" (৫০
ব্যবসায় (৫৬)	ব্যবসা (৫৬)
ফুলের (৬২)	বনের (৬২)
আলোক (৬৬)	আলো (৬৬)
কোণাঘাটে, ভাসে (৬৭)	কোনার ঘাটে, ভাজে (৬৭)
ভাসে (৬৮)	ভাজে (৬৮)
দাঁড়া (৭০)	দ্বারা (৭০)
পশ্চিমের পাড়ে (৭৩)	ঐ পুকুরের পশ্চিম পারে (৭৩)
বকুল বনে কলা বনে (৭৪)	কলা বনে কচু বনে (৭৪)
পথ (৭৬)	পদ্ম (৭৬)
মুণ্ড (৭৮)	মুণ্ডু (৭৮)
পশ্চিমেতে (৭৯)	পশ্চিমে (৭৯)
পূব দিকের (৮০)	পুবের দিগের (৮০)
"মনে রেখো" (৮৪)	"স্মরণ রেখ" (৮৪)
গিয়ে, নিজেও (৮৮)	গিয়া, নিজে (৮৮)
সুন্দর (৯০)	সুন্দরী (৯০)
করেন (৯২)	করে (৯২)
নাহি লজ্জা (৯৩)	লাজ লজ্জা (৯৩)
গাছেই (৯৮)	কাজেই (৯৮)
মেয়ের কথা (৯৯)	বোনের কথা (৯৯)
বুদ্ধি বিদ্যা (১০৯)	বিদ্যা বুদ্ধি (১০৯)
প্রজা শাসন (১১০)	প্রজা পালন (১১০)
সৎসাহস (১২০)	শত সাহস (১২০)
সহজ কথা (১২১)	সহজ কর্ম্ম (১২১)

কুন্তলিত, নাগের (১২৬)	কুণ্ডলিক, নাগের (১২৪)
পূবের দিকের (১২৭)	পূর্ব্ব দিকের (১২৫)
রাখে ভর (১৩২)	করে ডর (১৩০)
ভেরন (১৩৭)	ভেন্নার (১৩৫)
উহা (১৪০)	চিত্র (১৩৮)
মাপা (১৪১)	মাথা (১৩৯)
ফেলিয়ে (১৪২)	ফেলিয়া (১৪০)
লক্ষ লক্ষ (১৪৪)	লক্ষ আছে (১৪২)
পাইল (১৪৬)	পাল (১৪৪)
আকাল গাছের, মাকাল গাছের (১৪৮)	আকাল গোছের, মাকাল ফলের (১৪৬)
মাজিষ্টর (১৫৩)	মাজিষ্ট্রেট (১৫১)
শশী সিং (১৬২)	শশী সিংহ (১৬০)
আগবাড়া (১৬৪)	আগবারায় (১৬২)
হিসাব কিতাব (১৬৮)	হিসাব নিকাশ (১৬৬)
ব্যবসায় করেন (১৭০)	ব্যবসা করে (১৬৮)
ঝাটা খেকো (১৭৩)	"ঝাটা খেয়ে" (১৬৯)
শঙ্কা ভয়ে (১৭৬)	শঙ্কা ভরে (১৭২)
পশুর চেয়ে পশু এটা (১৮০)	পশুর পশু এটা (১৭৬)
রূপরাশি (১৮৫)	রূপের রাশি (১৮১)
আসতে (১৮৭)	আসবে (১৮৩)
ঘাড়ে (১৯১)	তারে (১৮৭)
যে (১৯২)	সে (১৮৮)
ধরিয়াছে (১৯৩)	রাখিয়াছে (১৮৯)
বেড়ায় (১৯৪)	বেড়াল (১৯০)
ভুষ্ট (২০৩)	পুষ্ট (১৯৯)
পরে (২০৮)	তারে (২০৪)
ঘুষকি (২১৩)	হুইস্কি (২০৯)
গড্ডুর নেকো পোড়ামুখো (২১৬)	"পোড়ার মুখো" "গরু খাঁ" (২১২)
করবেন (২২০)	করেন (২১৪)

কোন্ বা (২২৪)	কিবা (২১৮)
ব্যভিচার আর বিলাসিতার (২৩১)	ব্যভিচারে বিলাসিতার (২২৪)
করেন (২৩১)	কল্লেন (২২৫)
হিতকারী (২৩৩)	হিতাকাঙ্ক্ষী (২২৭)
হারি (২৩৪)	ছাড়ি (২২৮)
আছে হতভম্বা (২৩৫)	আছেন হতভম্ব (২২৯)
লয়ে (২৩৬)	নিয়ে (২৩০)
অঙ্গারকেব দল (২৪৩)	অহঙ্কারের দল (২৩৭)
আর (২৪৬)	কার (২৪০)
গজমূর্খ (২৬১)	গণ্ডমূর্খ (২৫৫)
কেবল বোতল (২৬২)	কেবল বলে বোতল(২৫৬)
বুড়ার (২৬৫)	ঘরের (২৫৯)
তাহাব (২৬৯)	উহার (২৬৩)
তস্য (২৯০)	এমনি (২৮৪)
তাৎ (২৯৫)	তাপ (২৮৯)
পোষ্টাপিসে চিঠিপত্র (২৯৯)	চিঠিপত্র পোষ্টাফিসে (২৯৩)
কবিয়ে (৩১৯)	করিয়া (৩০৭)
এখন (৩২০)	আসে (৩০৮)
জ্বালায়ে (৩২৫)	ভাঙ্গিয়ে (৩১১)
রাখতে (৩২৮)	রাখবে (৩১৪)
বুল হুইস্কি (৩৩০)	হুইস্কি ব্রেণ্ডি (৩১৬)
বেচিবে (৩৩২)	বিকাবে (৩১৮)
ভরিছে (৩৩৩)	ভরেছে (৩১৯)
হবে (৩৩৪)	হতে (৩২০)
কোটি (৩৩৭, ৩৩৮)	কুটী (৩২৩, ৩২৪)
বুড়ো রাজায় (৩৬৩)	বড় রাজারে (৩৩৭)
তত্ত্ব (৩৬৪)	তথ্য (৩৩৮)
কপিত্থ (৩৬৭)	কুপথ্য (৩৪১)
বিদ্যালয়টি (৩৭৩)	সে স্কুলটি (৩৪৬)
রাজোপাধি মেয়ের বিয়া (৩৭৯)	রাজার বাড়ীর মেয়ে বিয়ে (৩৫৩)

হবে (৩৮৬)	করা (৩৬০)
কণিক স্তৃতা (৩৯১)	রসিক স্তৃতা (৩৬৫)
নাই (৪০৯)	র্থর্গ (৩৮৩)
কি তার (৪১২)	কি বা তার (৩৮৭)
জা'গা (৪১৯)	যায়গা (৩৯৩)
বাঁধাইয়ে (৩২৪)	বাধাইয়া (৩৯৮)
শুদ্ধ ঘরের (৪২৬)	ক্ষুদ্র ঘরের (৪০০)
তিন শো গাঁয়ের (৪৩১)	তিন গাঁয়ের (৪০৫)
দিবে (৪৩৪)	দিচ্ছে (৪০৮)
সজ্‌না খাড়া (৪৩৮)	সজনা ছড়া (৪১২)
তারা (৪৮০)	আবার (৪৩৪)
আসল (৪৮১)	এ সব (৪৩৫)
ছিলেন আগে (৪৯০)	আছেন একটী (৪৪৬)
মাখলে (৫১৯)	দিলে (৪৭৩)
নোড়া (৫২৬)	পুতা (৪৮০)
প্রতি ছত্র প্রতি শব্দ (৫৩৪)	প্রতি শব্দ প্রতি ছন্দ (৪৮৮)
একটা নীলের দোসর (৫৩৯)	একটা আছে নিল বানর (৪৯৩)
ফিরে (৫৪২)	বেড়ায় (৪৯৬)
খেলিবারে (৫৫২)	লিখিবারে (৫০৬)
দিবে (৫৫৬)	দেয় (৫০৮)
নীল বানরের (৫৬৫)	নিল বাঁদরের (৫১৩)
দূরে নহে স্বরগপুর (৫৬৭)	নহে স্বর্গপুরটা দূর (৫১৫)
চন্দ্রনগর (৫৭৩)	চন্দন নগর (৫২১)
পুড়ছে অবিরল (৫৮৬)	পুরেছে অবিকল (৫৩৪)
কখনো বা খসে (৫৯৩)	কখন বা তা খসে (৫৪১)
এই টেনে নেয় (৫৯৫)	এই সে টেনে নেয় (৫৪৩)
টাকা (৬০৬)	টিকা (৫৫২)
মুনির মন (৬০৯)	মনিব মানুষ (৫৫৫)
তাকে (৬১৪)	পাকে (৫৬০)
চায় (৬১৭)	যায় (৫৬৩)

দু চার কথা কয়ে (৬১৯)	দুটা কথা বলে (৫৬৫)
ওদের (৬২৪)	তাহার (৫৭০)
ঝড় লেগে লড়ছে (৬২৬)	ঝলক লেগে নরছে (৫৭২)
মন্ত্রী নিয়ে (৬২৭)	মন্ত্রিনীও (৫৭৩)
পূর্ণ (৬৩৭)	পুরে (৫৮১)
ইহার (৬৩৮)	উহার (৫৮২)
রাজ্য (৬৩৯)	স্বর্গ (৫৮৩)
শতে শতে (৬৪৫)	শাতশ (৫৮৯)
ধূলা তোলা (৬৬২)	ধুনা তুলা (৫৯৬)
বিলাতি ঢাকের মত (৬৬৪)	বিলাতি জার ঢাকের মত (৫৯৮)
স্বর্গ নরক (৬৬৬)	সত্য নরক (৬০০)
কেড়ে কেড়ে (৬৬৮)	কেরে কুরে (৬০২)
কুসুম (৬৮৬)	কস্তুর (৬১৮)
শঙ্কা (৭০৮)	সংখ্যা (৬২৪)

(খ) **পংক্তির রূপান্তর :**

কিংবা যখন ঘরের ছেচে কেন ফেলিতে যায় (৪৫) — কিংবা যখন ফেন ফেলিতে ঘরের পিছে যায় (৪৫)

রাজার উপরে রাজা সেজে নিজে গাধা (৯৪) — রাজার উপর রাজা সেজে রাজা নিজে "গাধা" (৯৪

একে একে যত কথা লিখব সবি খুলি ১১২) — একে একে সকল কথা লিখব আমি খুলি (১১২)

তাহার উপর বনজঙ্গল আর এক উচ্চ টিলা ১৩৫) — তাহার পূবে বন জঙ্গল অনেক উচু টিলা (১৩৩)

মনে মনে ভাবেন তিনি স্বর্গপুরের রাণী (১৫১) — মনে ভাবেন তিনিই যেন স্বর্গপুরের রাণী (১৪৯)

আদর যতন কচ্ছে যেন ইষ্টি ঠাকুর এলে (১৬৬) — আদর যতন করছে যেমন ইষ্ট দেবতা এলে (১৬৪)

স্বর্গপুরের এ কলঙ্ক লিখতে লাগে লাজ (১৭৪) — স্বর্গপুরের কলঙ্ক এ যে লিখতে লাগে লাজ (১৭০)

দেশীয়দের ন্যায্য দাবী গ্রাহ্য নহে আর (২৫১)　　দেশ আমাদের
ন্যায্য দাবি গ্রাহ্য নাহি আর (২৪৫)

হাতী দিয়ে ঘর ভাঙ্গিয়ে ঘর জালিয়ে দেওয়া (৩৮৩)　　হাতী দিয়া ঘর
ভাঙ্গিয়া ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া (৩৫৭)

সঙ্গে সঙ্গে আরেক ভয় দূর হয়ে গেছে (৩৯৪)　　সঙ্গে সঙ্গে আর
একটী ভয় দুর হইয়া গেছে (৩৬৮)

পরিস্কৃত সড়কগুলি লোহার কাঁকর ঢালা (৪১৩)　　পরিস্কার
সরকগুলি লোহার কারার ঢালা (৩৮৭)

তাদের বাড়ীর ঘরের ছেচে কোণার পেছন দিয়ে(৪২৩)　　তাদের বাড়ীব
ঘরের ছেচের কোনাব পিছন দিয়া (৩৯৭)

ভাগ করিয়ে যাচ্ছে নিয়ে চাষার আশার ফল (৪৩৬)　　ভাগ করিয়ে
খাচ্ছে সবে চাষার আপন ফল (৪১০)

ধন্য ধন্য বুদ্ধিটা ঐ বন্য বলদটার (৪৭৪)　　ধন্য ধন্য ধন্য বুদ্ধি
বন্য বলদটাব (৪২৮)

বদনামী ঢাকিতে দেখ ফন্দি কেমন তার (৪৭৬)　　বদনামি ঢাকিতে
কেমন ভঙ্গি দেখ তার (৪৩০)

তবু বানর পাড়ায় পাড়ায় কিচির মিচির করে (৫৬৩)　　তবু বাঁদব পারায়
পারায় কিচির মিকির করে (৫১৪)

বৈশাখের মেঘ জড়ানো একাদশীর চাঁদ (৫৯২)　　বৈশাখ মাসের
মেঘ ছড়ান চতুর্দ্দশীব চাঁদ (৫৪০)

শারদ মেঘে আতকা যেমন চাঁদ খুলিয়ে দেয় (৫৯৬)　　শরৎ মেঘে
আকাশ যেন চাঁদ খুলিয়ে দেয় (৫৪৪)

কত কথা বলে কপট কুটিল কাল ঠার (৫৯৯)　　কত কথা বলে
কত কুটীল কপট ঠার (৫৪৭)

বোপদেবের মুগ্ধবোধ উপদেবতার তরে (৬০৫)　　বোপদেবেব মন্দ
বোধ সে উপদেবের তরে (৫৫১)

রূপার বাটায় ছাঁচি পানের আতর মাখা খিলি (৬২১)　　রূপার বাটায়
আতর মাখা সাচি পানের খিলি (৫৬৭)

সে ডাকিল বলে পড়ে অন্য ঘরে সরে (৬২৮)　　সে ডাকিল বলে
যাচ্ছেন সরে আরেক ঘড়ে (৫৭৪)

(গ) পরিবর্জিত পংক্তি ঃ

লিখব এ রহস্য কথা·· "কণিক-সূত্র তার !" (১২৩-২৪) নেই।

পচা গোবর···ধন্য এদের চেয়ে ! (১৭১-৭২) নেই।

ছাইমুখো আর · উজার কল্লে দেশ (২১৭ ১৮) নেই।

কেহ কেহ পত্র· জড়সড় হয়ে ! (৩০৩-০৪) নেই।

বেশী নাকি লজ্জা · পেটের ভিতব ঢোকে ! (৩০৭-০৮) নেই !

এমন করে বুঝায়েছে···তুচ্ছ করে থাকে ! (৩১৩-১৪) নেই।

হাতী দিয়ে ঘর· দিলে তাড়াইয়া ! (৩২১ ২২) নেই।

কৃষিশিল্প ব্যবসায় · যত্ন সুমহান ! (৩৪৭-৫৮) নেই।

জন্মে কভু হয় অনেক মহাত্মার ! (৪৩১-৪২) নেই।

এক শো টাকার বই·· তুইটি হাজার দেয় ! (৪৪৭-৫০) নেই।

বঙ্গদেশে অঙ্গারকের উসল করে নেয় ! (৯৫৩-৬৬) নেই।

ঘুস খাইয়া ছাপায় সমাজ করে ক্ষয় ! (৯৮৩-৮৬) নেই ! এই পংক্তিগুলির পরিবর্তে এখানে যে ছয়টি পংক্তি (বঙ্গদেশে অঙ্গারকের ·· লাঙ্গুল অবতার) রয়েছে, তার প্রথম চারটি পংক্তি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের নকলীকৃত পুস্তিকার ৯৫৩-৫৬ সংখ্যক পংক্তিতে এবং শেষের তুটি পংক্তি ৪৬৩-৬৪ সংখ্যক পংক্তিতে আছে।

পাণ্ডাহীন পণ্ডিতটার·· অশ্বঅন্তজ্ঞান ! (৪৯৫-৯৬) নেই।

উকিল দেখলে বলে···যত নিতে পার ! (৫৫৩-৫৪) নেই।

ডাক্তারকে বলে যদি·· দিতে যাহা চান ! (৫৫৯-৬২) নেই।

গালভরা তার·· পায় না বঁধু ! (৬০৩-০৪) নেই।

কেবা কুত্র বণিকসূত্র···বিষয় বোধ নাই ! (৬৩৩-৩৪) নেই।

স্বর্গ নরক কোথায়···নূতন মাগী চাই ! (৬৪৭-৫৬) নেই।

হাতীর উপর হস্তীমূর্খ.. কখন ঢোকে আসি ! (৬৬৯-৭৪) নেই। এই ছয়টি পংক্তির পরিবর্তে নিম্নলিখিত নতুন চারটি পংক্তি রয়েছে, যা যতীন্দ্রপ্রসাদের অনুলিখিত পুস্তিকায় নেই : দিন তুপুরে কবার যায়·· পুকুর ঘাটে যায় ! (৬০৩-০৬)

দেবত্ব দূরের কথা···পাপে ভেসে যায় ! (৬৮৭-৭০২) নেই।

জাগ জাগ দেবদেশের· ·তোমারি তোমারি ! (৭০৯-১৪) নেই। এই পংক্তিগুলির পরিবর্তে যে চল্লিশ পংক্তি এখানে দেখা যায়.

তা যতীন্দ্রপ্রসাদের নকলীকৃত পুস্তিকায় নেই : বঙ্গদেশে স্বর্গরাজ্য…প্রথম খণ্ড শেষ। (৬২৫-৬৪)

(ঘ) সংযোজিত পংক্তি

নেই

দিন দুপুরে কবার যায় সে ব্রজেশ্বরীর বাড়ী,
কখন চলে হাতী ঘোড়া কখন চলে গাড়ী।
পাষণ্ডদের তাণ্ডবেতে তিষ্টে থাকা দায়,
জোয়ান বৌ ঝি একলা নাহি পুকুর ঘাটে যায়।
(৬০৩-০৬)

নেই।

বঙ্গদেশে স্বর্গরাজ্য পাপের লীলা ভূমি,
তপ্ত শ্বাস দগ্ধ কল্লে ব্রজেশ্বরীর স্বামী।
স্বর্গরাজ্যের হাহাকার দারুণ কোলাহল,
পত্নীহারা পাগল পতির তপ্ত অশ্রুজল।
প্রজাগণের গৃহদাহের ধূম্র উল্কারাশি,
বিমল বৈকুণ্ঠ ব্যোম আচ্ছাদিল আসি।
সুরঙ্গনার কক্ষে খসে স্বর্ণ কলস,
সদাগতি স্তব্ধ গতি স্তব্ধ দিক দশ।
অরুণ বরুণ করুণ নেত্রে চতুর্দ্দিকে চায়,
চন্দ্র রবি মলিন সবি অগ্নি নিবে যায়।
রত্ন মণি গৃহে কাঁপে রত্ন সিংহাসন,
কোথায় লক্ষ্মী বলে মন ডাকেন নারায়ণ।
(এস) পূর্ণ হইয়াছে গর্দ্দভেন্দ্রের পাপ,
বৈকুণ্ঠ লুণ্ঠিছে দেখ প্রজার পরিতাপ।
মর্ত্তে ছিলেন লক্ষ্মীরাণী গাধা রাজার ঘরে,
বুড়া রাজার সাতপুরুষের পুণ্য কাজের তরে।
চঞ্চলা চঞ্চল হইল নারায়ণের ডাকে,
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া বল আর কেমনে থাকে।
পেঁচা পক্ষী ছেড়ে লক্ষ্মী হলেন অন্তর্ধ্যান,
কাল পেঁচার ডাকে গাধার কেঁপে উঠল প্রাণ।

অমুক অমুক যম[illegible] মত দিন দিগন্ত ছেয়ে
শাপলা ফুল গেল লজ্জা ভগ্ন মৃণাল নিয়ে
মনে এল হাজার হাজার মহারাজের রোল।
অসাধারক আর পাপী রাজার ইহকালের ভোল
অসাধারক মরিল আগে পাপী রাজা শেষে।
দু জনারে যম দূতেরা ধরিল কেশে কেশে॥
নিয়ে গেল যমের বাড়ী দুই রাজার টাই।
কর্ম দোষে বিচার হলে ওই সুপারিশ নাই।
কি কি বোলে কি কি শোনে মধ্যে রাজা দ্ব
কেমন করে মন্ত্র তাহার মন্ত্রী হারাম খায়
যম দূতেরা কেমন করে যমের বাড়ী নি
বিচার করে কোন বা পাপে কোন নর
কেমন বা সেই নরক দেখে যমের বাড়ী
পায় খানায় ডুবাইয়ে পাপীর মাথায়
লিখব সে পাপের শাস্তি লিখব সমুদয়।
হারাম খাওয়া পাপীর কত নিত্য নরক হয়॥
অসাধুকের মাঝে যত ছিল সঞ্চয়।
ব্যক্ত করে লিখবে তাদের ভণ্ড সে খবর॥

মাঝে মাঝে মগরাজদের পাইবে উদ্দেশ।
মগের মুলুক উপন্যাসের প্রথম খণ্ড শেষ॥

শ্রী সুধীররঞ্জন চক্রবর্তী কর্তৃক নকলীকৃত 'মগের মুলুক' পুস্তিকার শেষাংশ।

অযুত অযুত যমদূত সব দিগ দিগন্ত ছেয়ে,
পাপাঙ্কুশ শেল গদা ভল্ল মুশল নিয়ে।
সঙ্গে এল হাজার হাজার মহারঙ্গে রোগ,
অঙ্গারক আর গাধা রাজার ইহকালের ভোগ।
অঙ্গারক মরিল আগে গাধা রাজা শেষে,
দুজনারে যমদূতেরা ধরল কেশে ঠেসে।
নিয়ে গেল যমের বাড়ী ধর্ম্মরাজার ঠাই,
কর্ম্ম দেখে বিচার হবে এই সুপারিশ চাই।
কি কি রোগে কি কি ভোগে মল্লে রাজা গাধা,
কেমন করে মল্লে তাহার মন্ত্রী হারামজাদা।
যমদূতেরা কেমন করে যমের বাড়ী নিল,
বিচার করে কোন বা পাপে কোন নরকে দিল।
কেমন বা সেই নরক দেশের যমের বাড়ী·
পায়খানায় ডুবাইয়ে পাপীর মাথায়।
লিখব সে পাপের শাস্তি লিখব সমুদয়,
হারামজাদা গাধার কত নিত্য নরক হয়।
অঙ্গারকের সঙ্গী যারা ছিল সহচর,
ব্যক্ত করে লিখব তাদের গুপ্ত সে খবর।
খণ্ডে খণ্ডে পাষণ্ডদের পাইবে উদ্দেশ,
'মগের মুলুক' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড শেষ।

(৮২৫-৮৪)

নির্বাচিত কবিতাবলী

১. আমার বাড়ী
২. মৃত্যুশয্যায়
৩. নিমন্ত্রণ
৪. ভাওয়াল (৬)
৫. নির্ব্বাসিতের আবেদন
৬. ভাওয়ালে ভাই ফোটা
৭. কালীয় দমন
৮. ভাওয়াল
৯. ফিরে যাই
১০. বিক্রমপুরে বসন্ত
১১. কর্ত্তব্য
১২. কাপুরুষ
১৩. আমরা হরিহর
১৪. স্বদেশ
১৫. বেদমন্ত্র
১৬. স্বাধীনতা
১৭. পিপড়া
১৮. আমার চিতায় দিবে মঠ
১৯. বজ্র পেলে কই
২০. একলা নিতাই
২১. নববর্ষ
২২. তৃণ
২৩. কেন বাঁচালে আমায়

আমার বাড়ী

কোথা বাড়ী-কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই?
হায় সে দুঃখের কথা, মলিন মরম ব্যথা,
প্রাণপণে আমি যে তা ভুলে যেতে চাই।
স্মরণে পরাণ পোড়ে, বুক যেন ভাঙ্গে চোরে,
হায় সে দারুণ জ্বালা আজো কমে নাই!
কলিজা ধমনী শিরা, মনে লয় ফেলি ছিঁড়া,
নিজের শরীর নিজে কামড়াইয়া খাই!
সে অগ্নি-কাহিনী যাহা, কেমনে বলিব তাহা,
মনে না হইতে আগে পুড়ে হই ছাই!
বল না বলিব কিসে, মরি যে দারুণ বিষে,
আমি যে দেখিছি এর দেশে ওঝা নাই!
কোথা বাড়ী, কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই?

২

কোথায় বসতি মোর, কি শুধাও ভাই?
যে দেশে আছিল বাড়ী, চিহ্নমাত্র নাহি তারি,
সে দেশ পুড়িয়া গেছে, হয়ে গেছে ছাই!
রাবণের চিতা সম, জ্বলে জন্মভূমি মম,
ধুইয়া শ্মশান সেই বহিছে চিলাই!
সে দেশ থাকিত যদি, তবে কি হে নিরবধি,
দেশে দেশে ঘুরি আর কাঁদিয়া বেড়াই?
কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই?

৩

কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই?
যে দেশে আছিল ঘর, আমি সে দেশের পর,
সে দেশে যাইতে মোর অধিকার নাই!

আমারি-আমারি দেশে, আমারে খেদায় এসে,
আমারি মায়ের কোলে নাহি মোর ঠাঁই!
ইংরাজের রাজনীতি, দেয় না সে বজ্রগীতি,
জ্বলন্ত দীপক রাগে প্রাণ খুলে গাই!
ছিন্ন জিহ্বা সিংহসম, জীমূত গর্জ্জন মম,
হৃদয়-কন্দরে নিত্য নীরবে লুকাই!
কোথা বাড়ী কোথা ঘর কি শুধাও ভাই?

৪

কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই?
কেহই শোনে না যাহা, তুমি কি শুনিবে তাহা,
এ দুঃখ বলিতে নাহি ত্রিভুবনে ঠাঁই।
এ জগতে আছে যারা, সকলি পিশাচ তারা,
প্রকৃত মানুষ কা'রে দেখিতে না পাই।
সব বেটা ঘুষখোর, সব বেটা জুয়াচোর,
'ধ্বজাধারী' 'আর্কফলা' যার দিকে চাই!
'তু' করিতে মেলে হাত, হেন পায়ধরা জাত,
এমন বিবেকশূন্য দেশের বালাই!
কুকুরের চেয়ে নীচু, যদি আর থাকে কিছু,
আমি যে এদের বলি,—ঘৃণা করি তাই!
বলিব কাহার কাছে, কে বল মানুষ আছে,—
দয়াল ধার্ম্মিক বীর কোথা গেলে পাই;
করিতে আর্ত্তের ত্রাণ, কার বল কাঁদে প্রাণ;
তেমন মানুষ বুঝি ত্রিভুবনে নাই।
কোথায় বসতি মোর কি শুধাও ভাই?

৫

কোথায় বসতি মোর শুনিয়া কি ফল?
তুমি কি পারিবে তার, ঘুচাইতে হাহাকার,
মুছাইতে আঁখিভরা শোক-অশ্রুজল?

তুমি কি দেখেছ বুঝে, এত বল আছে ভুজে,
ছিঁড়িতে পারিবে তার লোহার শৃঙ্খল ?
হৃৎপিণ্ড বিদারিয়া, বুকের শোণিত দিয়া,
পারিবে নিবাতে তার দাহ-দাবানল ?
কোথায় বসতি তবে শুনিয়া কি ফল ?

৬

কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ?
যে দেশে আছিল বাড়ী, সে দেশের নরনারী,
স্বর্গের শিশুর মত সরল অন্তর !
দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, যেন সব ভাই ভাই,
কেবলি স্নেহেতে ছিল মাখা পরস্পর।
ছিল সবে শান্তি সুখে, সতত প্রসন্ন মুখে,
শতদলে গাঁথা যেন শতদল থর !
কত ছিল খেতখোলা, শস্যপূর্ণ ছিল গোলা,
ইন্দিরার যেন সব মন্দির সুন্দর !
সবারি আছিল হাল, গোয়ালে গরুর পাল,
দুধে ভাতে সকলেই পূরিত উদর।
আছিল নিঃশঙ্ক মনে, প্রিয় পরিবার সনে,
মা বোন্ সুন্দরী হলে নাহি ছিল ডর।
নিশীথে পতির বুকে, সতী ঘুমাইত সুখে,
কাড়িয়া নিত না কোন দানব পামর।
সে দেশে আছিল ভাই সুখে নারী নর।

৭

সে দেশ আছিল ভাই দেবনিকেতন।
ধার্ম্মিক প্রজার প্রিয়, দেবোপম পূজনীয়,
সে দেশে আছিল রাজা কালীনারায়ণ।
জননী সমান জানি, সত্যভামা ছিল রাণী,
মমতার মন্দাকিনী স্নেহ-প্রস্রবণ।

রাজবালা কৃপাময়ী, কৃপার তুলনা কই ?
রাজেন্দ্র নামেতে ছিলা রাজার নন্দন !
নাহি ছিল অবিচার, নাহি ছিল ব্যভিচার,
নাহি ছিল অনাথার করুণ ক্রন্দন !
যার খেত সে অবশ্য, পাইত তাহার শস্য,
পারিত না লুঠে নিতে চোর মন্ত্রিগণ !
সে যায় নি অধঃপাতে, সে খেত' আপন হাতে,
নিজেই নিজের রাজ্য করিত শাসন,
প্রজার কল্যাণে হিতে, সে চাহিত প্রাণ দিতে,
দেশের মঙ্গলে সদা আছিল যতন !
কৃষি শিল্প ব্যবসায়, রাজ্যের উন্নতি যায়,
তাহাতে অজস্র অর্থ করিত বর্ষণ,
প্রজার শিক্ষার তরে, কত যত্ন সমাদরে,
গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় করিত স্থাপন ;
নাহি ছিল জলকষ্ট, রোগে না হইত নষ্ট,
দেশে কভু নাহি ছিল অকাল মরণ,
কাটাইয়া জলাশয়, স্থাপিয়া চিকিৎসালয়,
প্রজার অভাব দুঃখ করিত মোচন !
ছিল 'প্রজাহিতৈষিণী', প্রজাহিত সংসাধিনী,
রাজার সে অদ্বিতীয় কীর্ত্তি অতুলন ;
কিন্তু তা কোথায় আজ, কোথা সেই মহারাজ ?
ডুবেছে সূর্য্যের সহ সহস্র কিরণ !
সে যে ছিল দেবপুরে দেবনিকেতন !

৮

যে দেশে আছিল বাড়ী, সে যে দেবপুর,
সেখানে ছিল না পাপ, নাহি ছিল পরিতাপ,
সে দেশে ছিল না ভাই দানব অসুর !
ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহারে, মরিতে হত না কারে,

দরিদ্র ভিখারী অন্ধ অনাথ আতুর,
রাজার দয়ার দানে, সকলে বাঁচিত প্রাণে,—
শ্রাবণের ধারা সম প্রভূত প্রচুর !
বিনা দোষে নির্ব্বাসিত, কারে না করিয়া দিত,
হাতী দিয়ে ভেঙ্গে ঘর করিত না চুর !
কিম্বা গৃহ পোড়াইয়া, সে দিত না খেদাইয়া,
সে ছিল না আততায়ী পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর !
সে ছিল ভগিনীভ্রাতা, সে যে ছিল পিতামাতা,
সে যে ছিল সকলের মাথার ঠাকুর !
হায়, কোথা গেলা আজ, দেবপুর-দেবরাজ,
হৃদয়ে হানিয়ে বাজ রাজাবাহাদুর !
যে দেশে আছিল বাড়ী, সে যে দেবপুর।

৯

যে দেশে আছিল ভাই বসতি আমার,
সে দেশে চিলাই তীরে, বিধৌত রজত নীরে,
আজিও শ্মশানে শয্যা আছে সারদার।
কুমুদ কমলে হায়, শরত সাজায় তায়,
সায়াহ্ন জ্বালায়ে দেয় দীপ তারকার,
কুয়াসা ধূমের রূপ, শিশির দিতেছে ধূপ,
বাজায় মঙ্গল-শঙ্খ হংস অনিবার !
প্রভাত পাখীর স্বরে, বসন্ত বন্দনা করে,
পবিত্র প্রণয়গীতি গাইয়া তাহার !
স্নেহের নয়নাসারে, বরষা ধোয়ায় তারে,
ঢালিয়া নবীন মেঘে নব জলধার !
দেবদেশে ছিল ভাই বসতি আমার !

১০

দেবদেশে ছিল ভাই দেবনিকেতন,
যত তরু যত লতা, সবই কল্পতরু তথা,
সে দেশের যত বন সকলি নন্দন !
সে দেশের স্রোতস্বিনী, সকলেই মন্দাকিনী,
সকলি অমৃত গঙ্গা সুধা প্রস্রবণ !
সে দেশের স্বর্ণভূমি, হায় কি বুঝিবে তুমি,
তরঙ্গিয়া উঠিয়াছে সুমেরু কেমন !
সে দেশে 'মানিকা বিলে', মাণিক-কমল মিলে,
কি ছার সে মানসের হেম-পদ্মবন !
আন্দোলিয়া নীল বারি, জল নিতে কুলনারী,
সলিলে গলিয়া পড়ে তরল কাঞ্চন !
সে দেশের নারীর ঠোঁটে, পারিজাত ফুল ফোটে,
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বহে সুধা সমীরণ,
তাদেরই আননে হয়, সে দেশের চন্দ্রোদয়,
তাদেরই চরণে ডুবে কনক তপন !
তাদেরই করুণা স্নেহে, নব বল আসে দেহে,
জরামৃত্যু করে যেন দূরে পলায়ন,
অমৃত তাদেরি কথা, সে আদর সে মমতা,
জুড়ায় বুকের ব্যথা জ্বালাপোড়া মন !
সে দেশে রমণী দেবী, আমি তারে নিত্য সেবি,
জননী ভগিনীরূপে পূজি শ্রীচরণ,
সে দেশে ত পর নাই, সবি পিতা সবি ভাই,
প্রাণের অধিক মোর সকলি আপন !
সে যে ছিল দেবপুর দেবনিকেতন !

১১

কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ?
যে দেশে আছিল বাড়ী, আজি তার নরনারী,
শোকে দুখে বিষাদিত ব্যথিত কাতর !

সয়তান লাগিয়া পিছে, কলম কাড়িয়া নিছে,
তাহারা হয়েছে আজ পশু বনচর,
তাহারা ভূতেরে পূজে, যুতা খায় মাথা গুজে,
পিঠে খায় কীল কুনি, গালে খায় চড় !
নীরবে সকলি সহে, মরার মতন রহে,
মা বোন সতীত্ব হারা করে ধড় ফড় !
ভাবিছে অদৃষ্ট সার, এই লিপি বিধাতার,
এত কাপুরুষ করে দৈবের নির্ভর,
এত গেছে অধঃপাতে, পিশাচের পদাঘাতে,
স্মরণে নয়নে অশ্রু বহে দরদর !
হায় সে দেশের কথা, দুঃখময় সে বারতা,
আমি যে রেখেছি বুকে চাপিয়া পাথর !
কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ?*

২৪শে বৈশাখ,
১৩০২ সন।
মধুপুর। E. I. R

* ১৩০২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত 'কস্তুরী' কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ১০২

মৃত্যু-শয্যায়

মা !

এই বড় দুঃখ মনে রহিল আমার
এই কাঙ্গালিনী বেশে,
এত কষ্টে—এত ক্লেশে,
এই বিমলিন মুখ—এই অশ্রুধার,
দেখিয়া যাইতে হ'ল জননী আমার !

২

দেখিয়া যাইতে হ'ল জননী তোমায়,
অন্নপূর্ণা উপবাসী,
আত্মগৃহে পরদাসী,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মর মর্ম্ম-বেদনায়,
দেখিয়া মরিতে হ'ল জননী তোমায়

৩

উহুহু !

এখনো মুমূর্ষু রক্ত উঠে উছলিয়া,
শত পুত্রে অভাগিনী,
শত রাজ্যে ভিখারিণী,
স্মরিতে মুমূর্ষু প্রাণ উঠে হুঙ্কারিয়া,
ধিক্কারে শিরায় রক্ত উঠিছে গর্জ্জিয়া !

৪

নিস্তব্ধ হৃদয়ে হয় আবার স্পন্দন,
মৃত্যু যেন দূরে যায়,
মৃত্যু যেন ভয় পায়,
ঈর্ষ্যাদগ্ধ চিত্তের এ তীব্র উত্তেজন
থাকিতে মৃত্যু-ও প্রাণ করেনা গ্রহণ !

৫

নাহি শান্তি জননীরে এ মৃত্যু শয্যায়,
সুখ তুমি শান্তি তুমি,
স্বর্গ তুমি জন্মভূমি,
জননী ভগিনী জায়া তুমি সমুদায়,
মরণে সুখ মা কোথা তব দুর্দ্দশায় ?

৬

কুটীর-নিবাসী আমি দরিদ্র ভিখারী,
জনমে পূরেনি আশা,
পাই নাই ভালবাসা,
নাহি মোর পুত্র কন্যা ভাই বন্ধু নারী,
পথের কাঙ্গাল আমি দরিদ্র ভিখারী !

৭

তথাপি জনমভূমি আছিল আমার,
ভার্য্যা সম অতি প্রিয়,
মাতৃসমা অদ্বিতীয়,
পূজনীয় সমতুল্য পিতৃদেবতার,
স্নেহের পবিত্র মূর্ত্তি কন্যা করুণার !

৮

তোমাকেই প্রাণভ'রে বাসিয়াছি ভাল,
তুমিই সকল ছিলে,
শান্তি দিলে সুখ দিলে,
তোমারি সন্তান বলে' সুখে দিন গেল ;
তোমাকেই প্রাণভ'রে বাসিয়াছি ভাল !

৯

যদিও

প্রাণের গভীর এই ভক্তি প্রেম স্নেহ,
সামান্য পল্লীতে বাস,
করিয়াছি বার মাস,
গোপনে বেসেছি ভাল নাহি জানে কেহ,

শতমুখে বাগ্মী বেশে,
বলি নাই দেশে দেশে,
তোমারে করেছি যত ভক্তি প্রেম স্নেহ ;
স্বদেশহিতৈষী বলি নাহি জানে কেহ !

১০

তবু মা তুমি ত জান হৃদয় আমার ?
এ প্রাণে যন্ত্রণা কত,
এ হৃদয়ে জ্বালা যত,
নিত্য যে তোমার তরে কত অশ্রু-ধার
ফেলিয়াছি, জান তা'ত জননী আমার ?

১১

কিন্তু মা এ বড় দুঃখ রহিল অন্তরে,
বৃথাই সে অশ্রুজল,
বর্ষিয়াছি অবিরল,
যে তুমি সে তুমি আছ যুগ যুগান্তরে,
হলনা সার্থক চক্ষু দেখিয়া তোমারে !

১২

এক বিন্দু রক্ত এই অশ্রুর বদলে,
যদি পারিতাম দিতে,
অভাগিনী তোর হিতে,
যে রক্ত পচিয়া গেল দাসত্ব-গরলে—
হয়ত সার্থক চক্ষু হ'ত পুণ্য ফলে ।

১৩

যাক্ যাহা হয় নাই, হল না এখন,
মরিতে বসিয়া আর
বৃথা সে ভাবনা তার,
বৃথা এ মুমূর্ষু প্রাণে মোহের স্বপন,
এ জনমে এ জীবনে বৃথা আকিঞ্চন !

১৪

কিন্তু মা,

যদিও বাসনা মম হল না সফল,
তথাপি আশার নেত্রে,
জাতীয় মিলন ক্ষেত্রে
দেখিতেছি ভবিষ্যত শক্তি মহাবল,
সজ্জিত করিছে তব প্রতিমা উজ্জ্বল !

১৫

পুনঃ যেন কহিনূর করি আহরণ,
শত সূর্য্য রাগ বিভা—
কিরীট গড়িছে কিবা
জননি তোমার শিবে করিতে অর্পণ ;
চমকি ত্রিলোক যেন করে নিরীক্ষণ !

১৬

আবার শোভিবে তুমি রাজরাজেশ্বরী,
আগেকার হস্ত ন্যস্ত
ম্লান অস্ত্র যে সমস্ত—
কলঙ্কিত শেল শূল অসি ভয়ঙ্করী,
মার্জ্জিত করিছে শত্রু-শোণিতে শঙ্করী !

১৭

মা,

এই বড় দুঃখ মনে রহিল আমার,
সেরূপ নয়ন ভরি
সম্রাজ্ঞী-ভুবনেশ্বরী—
দেখিতে নারিনু, দগ্ধ চিত্ত অভাগার,
'এম্প্রেস ইণ্ডিয়া' আজ কপালে আমার !

১৮

কেননা জন্মিনু আরো শতবর্ষ পরে,
তখন জন্মিবে যারা,
কত পুণ্যবান তারা,
সূর্য্যের দেবতা তারা মানবের ঘরে,
জন্মিবে ভবিষ্য বংশ তোমার উদরে!

১৯

যাই মা!
যদিও ব্যাকুল প্রাণ ব্যাধি-যন্ত্রণায়,
তোমার ভবিষ্য-বেশ
করে চিত্তে মোহাবেশ,
মিশিব তোমারি বুকে তব মৃত্তিকায়,
ভয় কি, যাইমা তবে,—বিদায়! বিদায়

৮ই শ্রাবণ, ১২৯০ সন
কলিকাতা

নিমন্ত্রণ

এস ভ্রাতৃগণ!
এস আজ প্রাণ খু'লে, এস ভিন্ন ভাব ভু'লে,
এ দগ্ধ হৃদয়ে এস করিহে গ্রহণ,
এস এক শোকে দুখে, এস এক ভাঙ্গাবুকে,
একই বিষণ্ণ প্রাণে করি আলিঙ্গন!
এস এক হাহাকারে, ভাসি এক অশ্রুধারে,
মিশাই হে উভয়ের রোদনে রোদন,
এস আজ প্রাণ খু'লে, এস ভিন্ন ভাব ভু'লে,
এস হে কাঁদিতে ভাই করি নিমন্ত্রণ,
এ দগ্ধ হৃদয়ে এস করি হে গ্রহণ!

* ১৩০৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত 'চন্দন' কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ৮৫

২

এস ভাই ভিন্ন ভাব করি পরিহার,
শুধু এই মহাপাপে, জননীর অভিশাপে,
নয়নের অশ্রুজল ঘোচেনা কাহার,
শুধু এই ভ্রাতৃভেদে, দুখিনী জননী খেদে,
জীবনে পড়িয়ে আছে মৃতের আকার,
শুধু এ পাপের জন্য, অঙ্গ বঙ্গ অচৈতন্য,
বীরজাতি বীরভূমি রাজপুতনার,
শুধু এ পাপের জন্য দুর্দ্দশা সবার !

৩

এস ভাই ভিন্ন ভাব করি পরিহার,
এস ভাই এক প্রাণে, এক ধ্যানে, এক জ্ঞানে,
অনন্ত জীবনে করি এক অঙ্গীকার !
রাখি এ অনন্ত হস্ত, সে কার্য্য সাধনে ব্যস্ত,
পবিত্র মহান সত্য করিতে উদ্ধার,
অথবা করিতে ব্যয়, যদি আবশ্যক হয়,
রাখি এই রক্তপূর্ণ কোটি রক্তাধার,
(এস) অনন্ত জীবনে করি এক অঙ্গীকার !

৪

ভাই !
এক হস্তে মুছিবেনা এত অশ্রুজল,
এক হস্তে ছিঁড়িবেনা এ পাপ শৃঙ্খল !
রক্তের সাগর চাই, এত রক্ত কোথা পাই,
এক বক্ষে নাহি তত শোণিত তরল,
অগস্ত্য-আগ্নেয়আশা, সীমাশূন্য সে পিপাসা,
ব্যাদিত গগনময় গ্রাসে গ্রহদল ;
রক্তের সাগর চাই—কোটি ভুজবল !

৫

এস ভ্রাতৃগণ !

এস এক শোকে দুখে, এস এক ভাঙ্গা বুকে,
একই বিষণ্ণ প্রাণে করি আলিঙ্গন,
এস আজ প্রাণ খু'লে, এস ভিন্ন ভাব ভু'লে,
নাশিতে দেশের শত্রু কবি নিমন্ত্রণ,
এ দগ্ধ-হৃদয়ে এস করিহে গ্রহণ !*

১২৯২-৯৩ সন

ময়মনসিংহ

ভাওয়াল (৬)

ওঠ ভাই, পরস্পর হাতে হাতে ধরি,
এমনি করিয়া হয় করিতে উত্থান,
দশ জনে ধর, যদি একজন পড়ি,
দেখিবে অমরবলে হবে বলীয়ান !
পতন সমুদ্র হতে রেণু রেণু করি,
ওঠ ক্ষুদ্র বাষ্পরাশি মেঘের আকারে,
ধর সবে বজ্রশিখা মহাভয়ঙ্করী,
অনন্ত মিলন বিনা কে ধরিতে পারে ?
যে দেশে এমনি ভাবে মিলে ভাই ভাই,
সে দেশে রহেনা মৃত্যু, রহেনা পতন,
সে দেশের মনে তাপ, চখে জল নাই,
সে নহে মানবদেশ দেব-নিকেতন !
তোমরা এমনি নীচ—এমনি অধম,
সামান্য বাষ্পের চেয়ে মহিমায় কম !†

১৭ই চৈত্র—১৩০১ সন

মধুপুর, E. I. R.

---

* ১৩০৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত 'চন্দন' কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ১৩

† ১৩০৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত 'ফুলরেণু' কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ১১১

নির্ব্বাসিতের আবেদন

তোমরা বিচার কর সবে !
আমি যদি হই দূষী, যাহা ইচ্ছা—যাহা খুসী,
যে শাস্তি করিবে ভাই সহিব নীরবে !
মার যদি যুতা লাথি,
লইব তা শির পাতি,
দেও যদি ফাঁসি শূলে—বিচারে যা হবে—
কখনো হব না ভীত,
অথবা বিষন্ন চিত,
পোড়াইলে তুষানলে, ডুবালে রৌরবে !
পবিত্র ঈশ্বর স্মরি,
বলিনু প্রতিজ্ঞা করি,
ছুঁইয়া তুলসী-তামা ঠাকুর মাধবে !
তোমরা বিচার কর সবে !

২

তোমরা বিচার কর ভাই !
কেন আমি দেশ ছাড়া, আত্মীয় স্বজন হারা,
কেন সে জনমভূমি দেখিতে না পাই ?
তোমরা যেখানে যেয়ে,
আদর সান্ত্বনা পেয়ে,
যাদেরে দেখিয়া হও সুখী সর্ব্বদাই,
আমারো ত পিতামাতা,
আছে সে ভগিনী ভ্রাতা,
আছে সে দুহিতা নারী সেখানে সবাই ?
আমারো ত লয় মনে,
মিশিতে তাদের সনে,
মাখিতে এ পোড়া বুকে তাহাদের ছাই ?

আমারো ত হয় আশা,
শুনিয়া তাদের ভাষা,
চিলাইর কলকলে পরাণ জুড়াই ?
তোমরা বিচার কর ভাই !

৩

তোমরা বিচার কর ভাই !
কোন্ দোষে কোন্ পাপে, বল কার অভিশাপে,
হইয়াছি নির্ব্বাসিত, বল দেখি তাই ?
করিনি ডাকাতি চুরি,
মারিনি ত বুকে ছুরি,
স্বপনে দেশের কোন ক্ষতি করি নাই !
শুধু তার হিতকামী,
তারে ভালবাসি আমি,
বুকের শোণিত দিয়া শুভ তার চাই !
কোন্ পাপে বল তবে,
এ শাস্তি আমার হবে,
জগতে ইহার নাকি সুবিচার নাই ?
শোন হিন্দু মোসল্‌মান,
শোন ভাই খিরিষ্টান,
উড়িয়া আসামী গারো বেহারী লুসাই,
ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা যার,
জনক জননী আর,
পবিত্র ঈশ্বর নামে দোহাই দোহাই !
তোমরা বিচার কর ভাই !

৪

তোমরা বিচার কর, কর প্রতিকার,
কেন সে মায়ের বুকে,
মরিতে দিবে না সুখে,
হইতে দিবে না মোরে ধুলা মাটি তার ?

ছাই হ'ব—ভস্ম হ'ব,
তারি বুকে মিশে র'ব,
ন সে দিবে না, তার কোন্ অধিকার ?
শত স্বর্গ, শত কাশী,
তার চেয়ে ভালবাসি,
ঃ যে অরণ্যপূর্ণা জননী আমার,
শত গঙ্গা হ'তে ভাই,
পুণ্যতোয়া ও চিলাই,
ত ঘাট ওর তীরে মণিকর্ণিকার !
ওর তীরে শ্যাম মাঠে,
পড়ে আছে কত ঘাটে,
ত যে কণ্ঠের আহা হীরা মণিহার !
বড় সাধ মনে মনে,
মিশিতে তাদের সনে,
হইতে সে চিলাইর চিতার অঙ্গার !
কন সে দিবে না, তার কোন্ অধিকার ?

৫

তামরা বিচার কর—জনসাধারণ,
এ নহে সামান্য শাস্তি,
এ ভাই যৎপরোনাস্তি,
ফাঁসির পরেই এই চির নির্ব্বাসন !
বিনা দোষে কেন তবে,
এ শাস্তি আমার হবে ?
দরিদ্র দুর্ব্বল আমি, এই কি কারণ ?
সংসারে আমার ভাই,
যদিও কেহই নাই,
তবু ত তোমরা আছ দেশবাসিগণ ?
নহ ত একটি দুটি,
বঙ্গবাসী আট কোটি,

সকলি কি কাপুরুষ অধম এমন ?
সবারি কি শূন্য বুক,
রক্ত নাই একটুক,
হৃদয়ে গলিত বিষ্ঠা করে সঞ্চরণ ?
এই ষোল কোটি হাতে,
বল নাই একটাতে,
নাহি কি অভয় দান, আর্ত্তের রক্ষণ ?
ষোল কোটি চক্ষু হায়,
জলবিন্দু নাহি তায়,
সকলি কি চিরশুষ্ক মরুর মতন ?
নাহি দয়া কারো প্রাণে,
কেহ ধর্ম্ম নাহি জানে,
কেহই বুঝে না হায় পরের বেদন ?
সত্যই কি বঙ্গদেশ,
ভরা শুধু ছাগ মেষ,
এখানে মানুষ নাহি জন্মে কদাচন ?
তোমরা বিচার কর জনসাধারণ !

তোমরা বিচার কর, আমারে যাহারা,
করিয়াছে নির্ব্বাসিত,
করিয়াছে বিড়ম্বিত,
করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয়দেশ ছাড়া,
পথের ভিখারী করি,
করিয়াছে দেশান্তরী,
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃধনে যারা !
গোষ্ঠী গোত্রে যারা যুটে,
জন্মভূমি নেয় লুটে,
ভয়ে নাহি কথা কহে দেশী অভাগারা,
যারা ভাই বস্ত্র হরে,
দিনে রেতে ঘরে ঘরে,

আকুলা জননী বোন্ কেঁদে হয় সার
তোমরা বিচার কর—কে হয় তাহা

৭

তোমরা বিচার কর, তাহারা কে হয়,
তারা নহে দস্যু চোর,
দুর্দ্দান্ত দানব ঘোর ?
পিশাচ রাক্ষস ভাই, তাহারা কি নয় ?
আমি সে দেশের অরি,
চরণে বিচূর্ণ করি,
যদি পাই, দিবানিশি এই মনে লয় !
সরল স্বদেশী মম,
বিদলিছে পশু সম !
আহা হা, সে দুঃখ ভাই, প্রাণে নাকি সয়
স্বপনে শিহরি উঠি,
জাগরণে মাথা কুটি,
মনে পড়ে ম্লান মুখ সকল সময় !
পিশাচ রাক্ষস ভাই, তাহারা কি নয় ?

৮

তোমরা বিচার কর—তোমাদের দ্বারে
দরিদ্র ভাওয়ালবাসী,
কাতরে কাঁদিছে আসি
পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে !
সহায় সম্পদ হীন,
দরিদ্র দুর্ব্বল ক্ষীণ,
কেমনে যাইব বল রাজার দুয়ারে ?
দেখ ভাই দেখ চেয়ে,
দেখ কি যাতনা পেয়ে,
দিন নাই রাত্রি নাই ভাসি অশ্রুধারে ;

দেখ কি বিষের জ্বালা,
শোণিত করেছে কালা,
দেখ কি নরকানল জ্বলে হাড়ে হাড়ে !
কে আছে দুঃখীর জন্য,
মানবে দেবতা ধন্য,
বাড়াও দয়ার হস্ত দীন অভাগারে !
সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বান,
কে আছ বীরের প্রাণ,
বাড়াও সবল হস্ত পাপের সংহারে !
দুর্ব্বল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে !

৯

তোমরা বিচার কর—কর প্রতিকার,
সবার চরণে ভাই,
কাতরে এ ভিক্ষা চাই,
জীবনে আকাঙ্ক্ষা নাই ইহা ছাড়া আর !
এই জীবনের কর্ম্ম,
এই জীবনের ধর্ম্ম,
এই জীবনের ব্রত করিয়াছি সার !
যাবৎ বাঁচিয়া আছি,
এ সাধনা লইয়াছি,
মুছাইব অশ্রুজল অভাগিনী মা'র !
বাঙ্গলার নর নারী,
অই শোন, শোন তারি,
কি যে সে গগনভেদী গভীর চীৎকার,
দানবে লুঠিছে তারে,
কাঁদে মাতা হাহাকারে,
পারি না সহিতে ভাই পারি না যে আর !

হও শীঘ্র অগ্রসর,
সবে মিলে পরস্পর,
সকলে সহায় হও দীন অবলার !
যে জাতি যেখানে থাক',
সতীর সতীত্ব রাখ',
আপনার মা বোনেরে স্মর একবার,
পেয়েছ যে প্রাণ, হস্ত,
পুণ্য কার্য্যে কর ন্যস্ত,
কর সমুচিত তার সাধু ব্যবহার,
উৎপীড়িত প্রপীড়িত ভাওয়াল উদ্ধার !*

১৮ই আশ্বিন—১৩০২ সন,
কলিকাতা

ভাওয়ালে ভাই ফোটা

জীবিত থাকিতে তুমি, তোমার সম্মুখে,
দানবে লুঠিল যেই ভগিনী তোমার,
হা পিশাচ ! নরপ্রেত ! বল কোন্ মুখে
নিলে নিমন্ত্রণ তার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ?
যাহার বীরের প্রাণ, বল আছে বুকে,
বিপদে ভগিনী পারে করিতে রক্ষণ,
যে পারে বোনের তরে প্রাণ দিতে সুখে,
তারি আজ পুরস্কার পূজা-আয়োজন।
ভগিনী তাহারি মাগে সুদীর্ঘ জীবন,
জয়মাল্য দেয় আজি তাহারি গলায়,
তোমাদের কাপুরুষে কোন্ প্রয়োজন,
তোমাদের গলে শুধু দড়ি শোভা পায়।

* ১৩০৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত 'চন্দন' কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ২১

তোমাদের ভালে নাহি শোভে ভাই ফোটা,
ও যেন গলিত বিষ্ঠা কলঙ্কের খোটা।*

৩রা কার্ত্তিক, ১৩০২ সন
কলিকাতা

কালীয় দমন

১

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
কেন আজি কি অসুখে,
বল না কি মনোদুখে,
মা তোমার সোণামুখ মলিন এমন ?
করুণামমতামাখা,
কল্প-তুলিকায় আঁকা,
কেন গো শিশিরে ঢাকা কমল নয়ন ?
বল না কি অবসাদে,
বল না মা কি বিষাদে,
অমল অমরমূর্ত্তি ম্লান কি কারণ ?
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

২

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
তোমার স্বভাবশোভা,
জগতের মনোলোভা,
কেন সে মলিন আজ শ্যামল কানন ?
পশুপাখী তরুলতা,
কি জানি পেয়েছে ব্যথা,
কি এত গভীর শোকে সবে নিমগন ?

* ১৩০৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত 'ফুলরেণু' কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ১১৯

কুসুম ফোটে না ডরে,
আতঙ্কে ঝরিয়া পড়ে,
মরিয়া রয়েছে যেন মলয় পবন !
কোকিল ডাকে না কুহু,
সদা করে উহু উহু,
কি বেদনা, কি সে ব্যথা, কিবা জ্বালাতন ?
শুনি না শিখীর কেকা,
শিখিনী কাঁদিছে একা,
শোকে করে কোকবধূ নিশি জাগরণ !
হরিণী হারা'য়ে হায়,
আকুল হরিণ ধায়,
বনে বনে খোঁজে যেন কেবলি মরণ !
কিবা ভয়ে কিবা ডরে,
অলি গুণ্ গুণ্ স্বরে,
শরমে মরম কথা করে আলাপন !
বসন্ত গিয়েছে চ'লে,
আর আসিবে না ব'লে,
কি এত মনের ক্ষোভে করি পলায়ন !
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৩

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
আনন্দ উল্লাসহীন,
কেন তুমি দিন দিন,
ঘরে-ঘরে শুনি কেন কেবলি ক্রন্দন ?
কেন বল ব্রজবাসি,
অধরে নাহি সে হাসি,
কি বিষাদে কিবা খেদে বিমলিন মন ?
কি আতঙ্কে কিবা ত্রাসে,
বল না কি সর্ব্বনাশে,
অবসন্ন অপ্রসন্ন ব্রজনারীগণ ?

কেন সে সুন্দর রূপে,
ভেবে মরে চুপে চুপে,
অনলে ঢালিতে চায় কমল-যৌবন ?
কেন সে সোণার ফুল,
রাঙ্গা মেয়ে—কাল চুল,
উজলি নদীর কূল—চারু চাঁপাবন,
কলসী লইয়া কাঁকে,
আসে না চাতক ডাকে,
কি ভয়ে করেছে তারা দূরে পলায়ন ?
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৪

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
শ্রীদাম সুদাম ভাই,
কেন সে আনন্দ নাই,
সাজিয়া রাখাল বেশে গোঠে গোচারণ ?
বাজায়ে প্রেমের বেণু,
লইয়ে আসে না ধেনু,
কেন মম দেশবাসী সখাসাথীগণ ?
ব্রজের জননী যারা,
হায় কি আতঙ্কে তারা,
দেয় না যাইতে বনে প্রাণের নন্দন ?
সকলি মৃতের মত,
জীবন করিছে গত,
কেন এত মানহত পশুর মতন ?
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৫

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
কেন ভীত ব্রজবাসি,
নিরাশায় যাও ভাসি,
জগৎ করে যে ঘৃণা দেখ না কখন ?

তোমরা কি পা'র ধূলি,
অসংখ্য সন্তান গুলি,
একটী মানুষ এতে নাহি কদাচন ?
সকলি কি ভস্ম ছাই,
একটী স্ফুলিঙ্গ নাই,
কালান্তক দ্যুতিমান মহা হুতাশন ?
সবি কি শৃগালরাশি,
আত্মবলে অবিশ্বাসী,
সিংহের সন্তান হায় নাহি একজন ?
বলিতে যে প্রাণ ফাটে,
জননী যাইতে ঘাটে,
দুষ্ট ইন্দ্র ঐরাবতে করে আগমন,
তোমরা দেখিয়া তাহা,
শুনে তার আহা ! আহা !
আকুলা জননী টানে দুকুল বসন !
কাননে পশুর মত কর পলায়ন !

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
দাদা বলরাম সবে,
বল আর কত সবে,
জীবিত থাকিয়া হেন মৃতের মতন ?
লুঠে নিল সরবস্ব,
ক্ষেতের সুপক্ক শস্য,
দেখ না কি হে লাঙ্গলী কৃষীবলগণ ?
দেশ নাশে দস্যুচোর,
কারো নাই গায়ে জোর,
সবাই মুষিকগর্ত্ত কর অন্বেষণ !
পৃথিবী বিদার' যাতে,
যে লাঙ্গল আছে হাতে
পার না শত্রুর বক্ষ করিতে কর্ষণ ?

বিদেশীরা নানা ছলে,
ভীরু কাপুরুষ বলে,
কেমনে সহিছ বল এত কুবচন ?
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৭

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
মোহনিদ্রা পরিহরি,
উঠ ভাই ত্বরা করি,
অই যে উদয়াচলে উঠেছে তপন !
দিগন্ত আলোকে ভাসে,
মহোৎসাহে মহোল্লাসে,
কি মহত্ত্ব কি দেবত্ব কি নবজীবন !
জড়ত্ব ঠেলিয়া পায়,
সকলেই আগে যায়,
উদ্দাম উদ্যমে যেন পূর্ণ প্রতিজন !
এস হই অগ্রসর,
আমরাও পরস্পর,
করিয়া নীচতা স্বার্থ চরণে মর্দ্দন,
করিগে প্রেমের খেলা,
পবিত্র প্রভাত বেলা,
কৃষিজীবনের সুখ গোঠে গোচারণ !
এস আমি যাই আগে,
প্রাণ রক্ত যদি লাগে,
আমিই তা কণ্ঠ হ'তে করিব অর্পণ,
তোমরা আমার শবে,
দাঁড়ায়ে উঠিও তবে,
স্বর্গের আরেক সিঁড়ি উপরে তখন ;
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন

৮

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
কেন গো মা ব্রজভূমি,
মলিন ব্যথিত তুমি,
থাকিতে তোমার আমি নন্দের নন্দন ?
সাধ্য কি রাক্ষস ক্রুর,
কি দানব কি অসুর,
ও পবিত্র দেবদেহ ছোঁয় কদাচন ;
গৃহদাহ, নারীচুরি,
নির্ব্বাসন, বুকে ছুরি,
ঘুচাইব অসুরের যত উৎপীড়ন !
আমি দৈত্যদর্পহারী,
আমি দৈত্যধ্বংসকারী,
আমি যে তোমারি কৃষ্ণ দানবদলন !
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

৯

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
আমার জীবন—আয়ু,
তোমারি মা জলবায়ু,
তোমারি স্নেহের সর মমতা-মাখন !
তোমারি মা শস্য ফল,
আমার বাহুর বল,
হৃদয়ে শোণিতরূপে করে সঞ্চরণ !
এ দেহ নিশ্চিত—খাটি,
তোমারি মা ধূলামাটি,
তোমারি স্নেহের অঙ্কে করেছ পালন !
যদি মা তোমারি হিতে,
পারি এ জীবন দিতে,
এই রক্ত এই মাংসে হয় প্রয়োজন,

কি আছে সৌভাগ্য আর,
এর চেয়ে মা আমার ?
আমি যে তোমারি কৃষ্ণ প্রাণের নন্দন
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

১০

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
কি ছার সে অঘাসুর,
নারীচোরা শঙ্খচূড়,
কালীয় নাগের দুষ্ট অনুচরগণ,
দীর্ঘচঞ্চু দীর্ঘনাসা,
কঠোর কর্কশ ভাষা,
ক্ষীণজঙ্ঘা বকাসুর বিকট-দর্শন,
দেবাসুর বৎসাসুর,
সকলি করিব চুর,
না রবে অসুর কুলে আর একজন ;
খোঁড়া দৈত্য তৃণাবর্ত্তে,
পূরিব পুরীষ গর্ত্তে,
কেশে ধরি বধিব সে কেশীর জীবন !
কালীয়ের কালমায়া,
পূতনা—পাপের ছায়া,
আর যত পাপিষ্ঠের দূতদূতীগণ ;
আঘাতি চরণমূল,
বধিব সে দৈত্যকুল,
আমি যে তোমারি কৃষ্ণ অসুরদলন !
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?

১১

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
পুণ্যদা যশোদা তুমি,
মা আমার জন্মভূমি,
আবার তোমার যশে ভরিবে ভুবন !

ছার ইন্দ্র দেবরাজে,
কি ভয় তাহার বাজে ?
রব গোবিন্দ আমি গিরি-গোবর্দ্ধন,
ঝাঁপায়ে কালিন্দীজলে,
বিষহ্রদে কুতূহলে,
হাবলে কালীয়েরে করি আকর্ষণ,
চরণে চূর্ণিব শির,
ক্রূর সর্প সে পাপীর,
াকে মুখে ফেনরক্ত করিবে বমন !
জগৎ বিস্ময়ে ভয়ে,
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ল'য়ে,
াদরে করিবে পূজা তব শ্রীচরণ !
আবার হাসিবে তুমি,
ব্রজভূমি জন্মভূমি,
দাণামুখে করিবে মা সুধা বরষণ !
আমি যে তোমারি কৃষ্ণ কালীয়দমন !*

৩শে ভাদ্র, ১৩০২ সন
কলিকাতা

ভাওয়াল

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা
ভাওয়াল আমার প্রাণ,
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !
তার সে মধুর প্রীতি, মনে জাগে নিতি নিতি,
লগে লগে রগে রগে লাগে যেন টান !
নিশিদিন নিরবধি, উছলে নয়ন-নদী,
তাহারি মমতা দয়া বুকে ডাকে বান !

* ১৩০৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত [illegible]

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

২

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
জননী দুহিতা নারী, যত কিছু সে আমারি,
সে আমার যাগযজ্ঞ সে আমার ধ্যান !
তাহারে ভুলিব কিসে, সে আছে শোণিতে মিশে,
স্বপনেও দেখি তার সে চারু বয়ান !
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

৩

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
কি তার মোহন রূপ, লাবণ্যের শত স্তূপ,
রহিয়াছে টেকে টেকে হয় অনুমান !
উজল কিরণময়, গ্রহতারা সমুদয়,
কনক কিরীট তার শিরে পরিধান !
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !
কণ্ঠেতে শোভিছে তাব, চিলাই-মুকুতাহার,
রজত ধবল ধার সদা বহমান,
তারি তীরে হায় হায়, শোভে মধ্যমণি প্রায়,
সারদার প্রমদার প্রেমের শ্মশান !
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

৫

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!
তাহার শ্যামল বন, মরকত-নিকেতন,
চরে কত পশু পাখী নিশি দিনমান,
মহিষ ভল্লুক বাঘ, প্রজ্জ্বলিত হিংসা রাগ,
কঙ্করে নখর শৃঙ্গ ক্ষুরে দেয় শান!
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

৬

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান!
তার সে পিকের ডাকে, জোস্না জমিয়া থাকে,
যামিনী মূরছা যায় শ্যামা ধরে তান!
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে, বনদেবতার কাছে,
পাপিয়া দয়েল করে মধুমাখা গান!
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

৭

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান!
তার সে মলয় বায়, হরিণী চমকি চায়,
অচলে উছলে পড়ে গলিয়ে পাষাণ;
তাহারি মধুর শ্বাসে, সুধা-সোমরস-বাসে,
দেবতা ছাড়িয়া আসে নন্দন উদ্যান!
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

৮

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !
তাহারি হরিণে চড়ি, লতার লাগাম ধরি,
ফুলের ধনুক পিঠে আসে ফুলবাণ !
মনে হয় ভুলে ভুলে, মঞ্জুরী মুকুলে ফুলে,
শোভে তারি শিলীমুখ সবিষ-সন্ধান !
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

৯

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
ছয় ঋতু মালাকার, চরণে চাকর তার,
বিবিধ কুসুম-ভূষা তারা করে দান,
ফুলের প্রতিমাখানি, চিরশোভা ফুলরাণী,
নিতি সে নূতন ফুল নাহি হয় ম্লান !
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

১০

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !
তার সে 'বেলাই' বিলে, নব মেঘ বরষিলে,
নায়রীর শত নাও হয় ভাসমান,
তাদেরি ছায়ায় জলে, ফুটে উঠে কুতূহলে,
নিশিতে কুমুদ, দিনে কমল উদ্যান !
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

১১

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
আশ্বিন এসে সে বিলে, সমাদরে সাধ দিলে,
কোড়ার কোমল-কণ্ঠে থোর মেলে ধান !
হেমন্ত কার্ত্তিক মাসে, নবগর্ভ পরকাশে,
ইন্দিরা আসিয়া করে কনকে কল্যাণ !
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

১২

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
আহা, তার নরনারী, ফেলে যে আঁখির বারি,
অবিচারে ব্যভিচারে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
বারমাস তের কাতি, দিনে রেতে সে ডাকাতি,
বুকে বিঁধে সদা মোর শেলের সমান !
তাদের কলিজা-ভাঙ্গা-যাতনা-আগুন রাঙ্গা,
শিরায় শিরায় জ্বলে শিখা লেলিহান !
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

১৩

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !
বুকের শোণিত দিলে. যদি তার শুভ মিলে,
যদি তার দুখনিশি হয় অবসান,
আপনি ধরিয়া ছুরি, আকণ্ঠ হৃদয়ে পূরি,
কলিজা কাটিয়া দেই করি শতখান।
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

১৪

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !
তাহার মঙ্গল হিতে, যদি আসে বাধা দিতে,
লইয়া ভীষণ অস্ত্র বাসব ঈশান,
পদাঘাতে পদাঘাতে, দেই তারে অধঃপাতে,
চরণ ধূলির সম নাহি করি জ্ঞান।
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

১৫

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
পাঁচটি বছর যায়, যদিও দেখিনা যায়,
যদিও অনেক দূর আছি ব্যবধান,
তথাপি করেছি পন, এই রক্ত এ জীবন,
সাধিতে তাহারি হিত—তাহারি কল্যাণ,
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !

১৬

ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
যদিও ভাওয়ালবাসী, সহায় হ'ল না আসি,
আজ তারা মহামূর্খ অবোধ অজ্ঞান,
বুঝিল না আত্মহিত, তবু ঠিক্—সুনিশ্চিত,
একদিন অবশ্যই করিবে উত্থান,
একদিন ভবিষ্যতে, এই মন্ত্রে শতে শতে,
করিবে ভাওয়ালবাসী আত্ম-বলিদান,—
সে ভীষণ কোচবংশী, অরণ্যে বাঘের অংশী,
প্রকৃতির প্রিয় পুত্র বীর বলবান,

পাপিষ্ঠ অসুরবংশ, অবশ্য করিবে ধ্বংস,
শুলপীতে শূয়র সম বিঁধিয়া পরাণ !
স্নেহের প্রতিমাখানি, অরণ্যের মহারাণী,
শস্যের কনক হাস্যে চির শোভমান,
পরিয়া স্বর্গীয় বেশ, উজলিবে দিক দেশ ,
আমার মায়ের পূজা হবে সমাধান !
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !*

২৩শে আষাঢ়, ১৩০৩ সন
লতপ্‌দি—ঢাকা

ফিরে যাই

ফিরে যাই, ফিরে যাই !
দরিদ্র ভিখারী বেশে, ঘুরিলাম কত দেশে,
কোথাও করুণা নাই, কোথাও করুণা নাই ;
ফিরে যাই, ফিরে যাই !
জুড়াইতে দগ্ধবুক, মুছাইতে অশ্রুমুখ,
কারে না খুঁজিয়া পাই, কারে না খুঁজিয়া পাই ;
ফিরে যাই, ফিরে যাই !
প্রাণের হাহাকার, কেহ না শুনিল আর,
আর না শুনাতে চাই, আর না শুনাতে চাই ;
ফিরে যাই, ফিরে যাই !
লোহায় মানুষ গড়া ভিতরে পাথর ভরা,
আগে ত জানিনে ছাই, আগে ত জানিনে ছাই ;
ফিরে যাই, ফিরে যাই !

*১৩০৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত 'চন্দন' কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ১

পথ ভুলে' আসিয়াছি, কিছুই নাহিক যাচি,
কর' না মলিন মুখ, কাজ নাই, কাজ নাই ;
ফিরে যাই, ফিরে যাই !*

৫ই ভাদ্র,—১৩০৩ সন
কলিকাতা

বিক্রমপুরে বসন্ত

বউনাগাছে ফুল ফুটেছে, আগ্‌ড়া গাছে গোটা,
মান্দারগাছে আন্ধার বাড়ী, সারা উঠান ওঠা !
সারি সারি গাছ গুপারি শিরে ক'খান ডাল,
শুষ্কদেহ সন্ন্যাসীদের মাথায় জটাজাল !
বিনাফুলে ফল ধরেছে যজ্ঞ ডুমুর গাছে,
কুন্তী দেবীর কোল যুড়িয়া শত কর্ণ আছে !
কিম্বা গাছের কাল বসন্তে সুখ ধরেনি গায়,
সারা গায়ে ঘুঙ্গুর বেঁধে নাচ্‌ছে মলয় বায় !
অথবা সে "ধনামনার" গোদের যেন বীচি,
ঠিক্ বুঝিনা কোন্‌টা যেন বক্‌ছি মিছামিছি !
কোন্ নারী সন্ন্যাসী হ'ল, বেত্রবনে তার,
পাণ্ডবের গাণ্ডীবের মত, রেখ্‌ে আঁখি ঠার !
ডাঙ্গায় মরে খেজুর ভায়া গলায় কল্‌সী বেঁধে,
মান ভাঙ্গে না প্রাণ প্রেয়সী রাত্ পোহায় সে কেঁদে
ঝোপা ঝোপা থোপা থোপা ঝুলছে কাচি আম,
বিরহিনী নারীর যেন নূতন মনস্কাম
গাবের গাছে নূতন পাতা সিন্দুর চেয়ে লাল,
প্রেমের যেমন শেষটা কাল, কষ্‌টে ভরে গাল !
মট্‌কিলা পিট্‌কিলা ছিট্‌কী সবার নূতন পাতা,
নূতন বছর আস্‌ছে বলে খুল্‌ছে নূতন খাতা !

---

* ১৩০৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত 'চন্দন' কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ১২০

তেঁতুল গাছে পাকা তেঁতুল ঝুলছে মন্দ বাতে,
তেলী শুড়ি বৈরাগীর যেন মালার থলি হাতে!
রোয়াইল গাছে রোয়াইল ঝোলে এক বোঁটাতে কত,
হিন্দুস্থানী রাজ রাজাদের 'কেউচা রাণীর' মত!
কাকের শব্দে কোকিল জব্দ, কাকের কা কা খালি,
ননদের যেন চির সনদ বউকে দিচ্ছে গালি!
চাল ধুইতে, ভাত রাঁধিতে, ঠাকুর ঘরে গেলে,
নৈবেদ্যের কলাটি আগে কাকে খেয়ে ফেলে!
হাড়গিলে শকুন চিলে মাথার উপর উড়ে,
যেন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিররা যাচ্ছে স্বর্গপুরে!
তাই দেখিয়া কাতর হিয়া কুরুয়া সে ডাকে,
সমধর্ম্মী স্বর্গে যায় তাই নিন্দে বিধাতাকে!
হেথা, গীতের মালিক পেচা সালিক তারে পেয়ে ভয়,
দেশ ছাড়িয়া দয়েল শ্যামা গেছে মনে লয়!
ডাহুক ডাকে "আহুক আগে" আমার কাছে কে,
হাইরা কুঁও ঝাইরা মাথা বল্‌ছে নে—নে—নে!
পথের ধারে খালের পারে বিষ্ঠা বিক্ষেপণ,
প্রলয় ভেবে পলায়ে যায় মলয় সমীরণ!
অলি মাছি নাই এদেশে গুয়ের মাছি উড়ে,
ভ্রমর গিয়ে খেলছে প্রিয় অমর দেবপুরে!
কোথায় সে কুরঙ্গ রঙ্গ কোথা কুরঙ্গিনী,
নারীর নয়নে শুধু একটু একটু চিনি!
পুষ্পবিনে পুষ্পশর কোথা পাবে আর,
তাই, রমণী দিয়েছে কামে নিজের আঁখি ঠার!
বাড়ীর পাশে খানা খন্দ অন্ধ দাম দলে,
তাইতে বাঁধা পায়খানাটি পূর্ণ পচামলে!
ছেলে আছে হিজলগাছে বাঁশের সিঁড়ি লাগা,
মেয়ে বুড়ো বউঝিদের সে গাছের আগে হাগা!
নরকের শড়কের মত মাঝে তাহার আইল,
এই পথেই যাচ্ছি যাব আজকে আবার কাইল!

কল্‌মীশাকে হেলেঞ্চাতে পানায় পুকুরভরা,
বিধবা রমণীর মত বেঁচে থেকে মরা !
পানিকাউড় গউর প্রেমে ডুব্‌ছে তাহে বুঝি,
অহিংসা পরমধর্ম্ম বেড়ায় খুজি খুজি !
মোটা মোটা তিলক ফোটা পিপির শিরে শোভে,
বকে নিছে সখের ধর্ম্ম বাবুর মত লোভে !
"গেঁতর—গেঁতর"—সন্ধ্যাকালে কান পাতা না যায়,
অঙ্গ বঙ্গে কঙ্গরসের বেঙ্গ-বক্তৃতায় !
ঘোড়ায় ঘোড়ায় চল্‌ছে টিয়া মাঠের পানে ধায়,
নমাজ পড়তে সমাজ ঘরে সেমিজ পরে' গায় !
পাতার তলে জোনাক জ্বলে মধুর তত নয়,
বধুর অঞ্চলের দীপ সে মধুর অতিশয় !
ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যারতি শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
পতির ঘরে প্রদীপ জ্বলে নীরব প্রেমে লাজে !
চাক্‌রে পুরুষ যারা, তাদের শূন্য খালি বাড়ী,
হাহা হুহুর রাজ্যে করে আহা উহু নারী !
পরদাহীনা মরদা মেয়ে পদ্মা নদীর প্রায়,
ঠৈরাণদিদি বেড়ান আশে বাবুর বাড়ী যায় !
বাড়ী বাড়ী বৈঠক তাহার, পাড়ায় পাড়ায় হাট,
এম্‌নি তিনি রায়বাঘিনী দেখ্‌লে সবাই কাঠ !
কথার চোটে আগুন ওঠে ডিনামাইটের মত,
মানুষ ত সে দূরের কথা—পাহাড় উড়ায় কত !
কিবা পুরুষ কিবা নারী সবাই করে ভয়,
ফেলে দাড়ী নারদ নারী, এমনি মনে লয় !
কন্দলে আনন্দ বড় তা ছাড়া সে নাই,
মান্দার গাছে আন্দার রেতে লড়াই করে তাই !
বউয়ের কথা ঝিকে বলে, ভাইয়ের কথা বোনে,
বাপের কথা মাকে বলে, পুতে যাতে শোনে !
ঘরের কথা পরে বলে, পরের কথা হাটে,
হাটের কথা ঘাটে বলে, ঘাটের কথা মাঠে !

যাবৎ নাহি বলে তাবৎ পেট ফাঁপিয়া মরে,
বিসূচিকা রোগীর মত ধড় ফড়ানি করে!
ভাল কথার মন্দ অর্থে বিষম মল্লিনাথ,
গন্ধে তাহার বন্ধ্যা নারীর হয় যে গর্ভপাত!
সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, তার কথায় দিলে সায়,
ষণ্ডামার্ক তাহার কাছে সার্টিফিকেট পায়!
বিপরীতে গণ্ডমূর্খ বাখানিয়া তারে,
ফিরি করে' ফিরেন তিনি লোকের দ্বারে দ্বারে!
বঙ্গবাসীর বিজ্ঞাপনে কাজ কি আমার ভাই,—
বিশ্ব ঘোষা এমন ঘোষা ত্রিভুবনে নাই!
সকল দুখের মধ্যে দিছে এই সুবিধা বিধি,
বিনা পয়সার বিজ্ঞাপন সে আমার ঠৈরাণদিদি!
পেট্‌টী ওচা নাক্‌টী বোচা, রূপের নাহি সীমা,
ঠাকুরদাদার প্রেমের আমার পুরাণ লোয়াজিমা!
ঠাকুরদাদা স্বর্গে গেছেন তারে বদল দিয়া,
আমার বুকের শান্তি, আমার চখের নিদ্রা নিয়া!
বিনিময় সূত্রে আমি পাইয়াছি তারে,
ব্রহ্মরন্ধ্র বিঁধি তিনি আছেন মজ্জা হাড়ে!
অইসে আসে উর্দ্ধশ্বাসে আঁচল উড়ে বাতে,
ভয়ঙ্করী রণতরী পাইল পেয়েছে তাতে!
কিম্বা সতী ধূমাবতী দেখা যাচ্ছে দূরে,
মাথার উপর কাউয়াগুলা কা কা করে উড়ে!
কল্পনা সতিনী তার এরূপ দেখিয়া ভাগে,
যেমন, ইন্দুর ডরায় বিড়াল দেখে, গরু ডরায় বাঘে!
কম্প দিয়ে থাম্‌ছে কলম ঝম্প দেখে ত্রাস,
এখন, ঠৈরাণদিদির সঙ্গে করি বসন্ত-বিলাস! *

*কবিতাটি 'নব্যভারত' পত্রিকার ২০শ খণ্ড, ১২শ সংখ্যায় (চৈত্র, ১৩০৯) প্রকাশিত। পৃঃ ৬৩৫

কর্ত্তব্য

১

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শতদিকে শত দুঃখ আসুক—আসুক।
এ সংসার কর্ম্মশালা,
জ্বলন্ত কালান্ত জ্বালা,
পুড়িতে হইবে গাদ থাকে যতটুক,
অযুত আঘাতে নিত্য,
গড়িতে হইবে চিত্ত,
যুদ্ধ জয়েচ্ছুক ;
দিতে হবে বজ্র শাণ,
উজ্জ্বল করিতে প্রাণ,
তবে সে উজ্জ্বল হবে মুখ।

২

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
অনন্ত বিপদ দেও আসিবে আসুক।
রুদ্ধ করি ব্যূহপথ,
থাক্ শত জয়দ্রথ,
অমরের প্রিয় সে যে সমর কৌতুক,
সে অনন্ত কুরুসৈন্য,
ভীরুর দৌর্ব্বল্য দৈন্য,
ডরে না জম্বুক!
সাগর তরঙ্গ ঠেলি,
তিমিঙ্গিল করে কেলি,
কূপে কাঁপে কূপের মণ্ডূক!

৩

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শিরোপরে শত বজ্র গর্জ্জিবে গর্জ্জুক।

রহ হিমাদ্রির মত,
হইও না অবনত,
পতঙ্গের পদাঘাতে তৃণ অধোমুখ!
হলে হও খণ্ড খণ্ড,
সৃষ্টি করি লও ভণ্ড
ব্রহ্মাণ্ড কাঁপুক!
গম্ভীর গৌরব ভরা,
মহাদম্ভে ভেঙ্গে পড়া,
কি আনন্দ! কি প্রচণ্ড সুখ!

৪

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
অনন্ত মরণ যদি আসিবে আসুক!
স্থাপ' তুমি জয়স্তম্ভ,
কর আত্ম অবলম্ব,
দেও অস্থি মেদ মজ্জা লাগে যতটুক,
শত সূর্য্য করি গুড়া,
গড়' সে উজ্জ্বল চূড়া,
দেবতা দেখুক!
বাধা বিঘ্ন ঠেলি পদে,
সিংহ ফিরে বীরমদে,
আত্ম গুপ্ত সভায় শম্বুক!

৫

ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
সংসারের শত দুঃখ আসিবে আসুক!
ক্ষুধাতুর শিশুবক্ষে,
উপবাসী নারীচক্ষে,
চাহিয়া দেখ' না তার ম্লান অশ্রুটুক,

ফিরিয়ে শুন না তার,
অন্ন বিনা হাহাকার,
কাঁদিবে কাঁদুক!
বীরের সন্ন্যাস ধর্ম্ম,
ছিঁড়ে ফেলা হৃন্মর্ম্ম
কর্ত্তব্য রাখিতে জাগরূক! *

কাপুরুষ

হা রে ভীরু কাপুরুষ হা রে নরাধম,
দৈবে আমি মরি যদি,
তারি লাগি নিরবধি,
করেছিস কত নাকি মারণের ক্রম?
করেছিস্ তন্ত্র মন্ত্র,
কত নাকি ষড়যন্ত্র,
গোবরের শিব গড়ি পূজিস অধম?
নিয়েছিস্ চুল নখ,
হা রে মূর্খ আহাম্মক,
কে তোরে এমন বুদ্ধি দিয়েছে বিষম?
নিয়েছিস্ বিষ্ঠা মূত্র,
রে বিষ্ঠাখেকোর পুত্র,
বিষ্ঠাই মাখিলি গায়—বৃথা পরিশ্রম।
যারে ভগবান রাখে,
কে পারে মারিতে তাকে,
আপনি তাহারে দেখে ভয় করে যম!
আমি যে বুঝিতে নারি,
কি ক'রে পাকালি দড়ি,
এ বুড়া বয়সে তোর ঘুচিল না ভ্রম?
হা রে ভীরু কাপুরুষ হা রে নরাধম!

* কবিতাটি 'নব্যভারত' পত্রিকার ২১শ খণ্ড, ১০ম সংখ্যায় (মাঘ, ১৩১০) প্রকাশিত পৃঃ ৫৩০

হা রে ভীরু কাপুরুষ হা রে নরাধম
এতেও সে পাপ আশা,
গেলনা চণ্ডাল চাষা,
গেলনা উন্মাদ তোর সে পাপ উত্তম ?
আবার সে মোহে মাতি,
পাঠাইলি গুপ্তঘাতী,
গোপনে বধিতে মোরে, এ কি লজ্জা কম ?
মোর নামে হা রে পাপী,
সত্যই উঠিস্ কাঁপি,
হিরণ্যকশিপু সম দানব অধম ?
আমি যদি মরে যাই,
বলিবার কেহ নাই,
প্রাণের আতঙ্ক তোর হয় উপশম,
চারি দিকে ব্যঙ্গভাষী,
বাজাইবে ঢোল কাঁসী,
জামাতা বাহবা দিবে অজ অনুপম !
কিন্তু বল্ নারীচোরা,
এতে কি লাগিবে যোড়া,
সে যে রে কেটেছে নাক বড়ই বিষম !
কে ভুলিবে শূর্পণখা,
তার সে মদন-সখা,
অনন্ত রসের সেই কথা অনুপম ?
হা রে ভীরু কাপুরুষ হা রে নরাধম !*

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

* ১৩১২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে প্রকাশিত 'বৈজয়ন্তী' কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ৬৬

আমরা হরিহর

আমরা হরিহর,
আমরা বঙ্গ আমরা আসাম,
হৌক না মোদের সহস্র নাম,
আমরাই সদিয়া সিন্ধু সেতু রামেশ্বর,
আমরা নাগা আমরা গারো,
কেহই ত পর নহি কারো,
খড়্গী বর্গী গুর্খা জাঠ আর পার্শী সওদাগর।
পাণ্ডিচেরী ফরাসডাঙ্গা,
নামে কি যায় ভারত ভাঙ্গা?
কেউ বা কালো কেউ বা রাঙ্গা একই কলেবর।
কেউ বা চরণ কেউ বা হস্ত,
বক্ষ চক্ষু ললাট মস্ত,
একই দেহের রক্ত মাংস আমরা পরস্পর।

২

আমরা হরিহর,
একই সলিল একই বায়ু,
একই মৃত্যু পরমায়ু,
একই মোদের শীত বসন্ত একই দিবাকর।
একই মোদের ক্ষুৎপিপাসা,
একই ভরসা একই আশা,
এক আকালে এক পেলেগে মরি নিরন্তর।
পীলা ফাটে একই বুটে,
একই পিশাচ নারী লুঠে,
একই ঘৃণা একই লাজে সবাই জর জর।
একই মোদের দণ্ডবিধি,
একই মোদের গুণের নিধি,
এক চরণে তিরিশ কোটি লুঠি নারী নর।

একই ক্ষোভে একই রোষে,
সবার বুকের রক্ত শোষে,
গর্জ্জে প্রাণে অপমানে বজ্র ভয়ঙ্কর।
এক মরণে আমরা মরি সবাই নারী নর।

৩

আমরা হরিহর,
পশু পক্ষী তরু লতা,
ভারতের যে আছে যথা,
অণু রেণু কীট পতঙ্গ জঙ্গম স্থাবর,
কামার কুমার জোলা তাঁতী,
হাড়ী মুচি সকল জাতি,
মুনি ঋষি গরীব দুঃখী রাজা রাজ্যেশ্বর
নাইক নীচ নাইক উচ্চ,
নাইক প্রধান নাইক তুচ্ছ,
কোরাণ পুরাণ জেন্দাবস্তা সবাই একত্তর,
ভাই ভগিনী তিরিশ কোটি,
আমরা যদি জেগে উঠি,
আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখ ডর?

আমরা হরিহর,
আমাদের যে শক্তি মরা,
ছিল পড়ে ভারত ভরা,
ছিন্ন অঙ্গ পীঠে পীঠে ভিন্ন পরস্পর;
যুগ যুগান্ত হল গত,
মরার চেয়ে মরার মত,
রুদ্র হয়ে ক্ষুদ্র ছিলাম মরার অনুচর।
আমাদের যে লক্ষ্মী রাণী,
কোন্ অভাগার পাপে জানি,
সাগর জলে ঝাঁপ দিয়েছে আজি ক বছর

কোন্ বিদেশী বণিক নেয়ে,
নিল তারে পথে পেয়ে,
যত্ন করে রত্ন ঝাঁপি নেইনি সে খবর !
আয়রে আমরা তিরিশ কোটি,
ভাই ভগিনী সবাই যুটি,
লভি আজ যে নূতন শক্তি নূতন কলেবর,
আয়রে আমরা আগাগোড়া,
ভাঙ্গা ভারত লাগি যোড়া,
আয়রে পূজি মায়ের চরণ মায়ে দিবেন বর !
আয়রে অজগর দিয়া,
সপ্ত সিন্ধু মথি গিয়া,
ইন্দিরা সে বন্দী কোথায়—ধবল বালুচর।
ভয় কিরে ভাই চুমুক দিয়া,
উঠলে গরল ফেল্‌ব পিয়া,
মাথায় যদি গর্জ্জে ফণী ভালে বৈশ্বানর
ভয় কিরে ভাই তিরিশ কোটি,
যম দেখিলে পলায় ছুটি,
মৃত্যু জয়ী হবি যদি মায়ের পূজা কর।
আয়রে পূজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর।

৫

আমরা হরিহর,
বাজারে ভাই বিজয় শিঙ্গা,
ডুবল কোথায় সপ্ত ডিঙ্গা,
সাগর সেঁচে তুলব এবার 'চাঁদর' 'মধুকর'।
দেখব মায়ের গজ গিলা,
দেখব মায়ের শক্তি লীলা,
সাগর সেঁচে তুলব এবার 'শ্রীমন্তের টোপর'।
আয়রে পূজি মায়ের চরণ মায়ে দিবেন বর।

৬

আমরা হরিহর,
একটা পদ্ম আঁখি দিয়া,
রাম পূজিল লঙ্কা গিয়া,
শঙ্কা কিরে, আমরা ত ভাই তারি বংশধর !
আয়রে আমরা সবাই যুটি,
পূজি মায়ের চরণ দুটি,
উপাড়িয়া ষষ্টি কোটি নেত্র মনোহর।
হৃৎপিণ্ড মুণ্ড হস্ত,
আর যা লাগে সে সমস্ত,
আয়রে সবাই দেইরে মায়ের পদ্ম পায়ের পর
অনেক দিন মা পায়নি পূজা,
সাগর পরা শ্যামল ভুজা,
নলিন চরণ মলিন মায়ের রক্তে রাঙ্গা কর।
আয়রে পূজি মায়ের চরণ মায়ে দিবেন বর।*

স্বদেশ

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে ? এদেশ তোমার নয় ;—
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হ'ত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয় ?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্মা ভরা চুনি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয় !

২

এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা, তোমার ত নয় একটি ছড়া,
তোমার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয় ?

*কবিতাটি 'নব্যভারত' পত্রিকার ২৩শ, খণ্ড, ৭ম সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩১২) পৃঃ ৩৯৩ প্রকাশিত।

তুমি পাওনা একটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠি,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎ ভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়!

৩

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এদেশ তোমার নয়,
এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী, এই যে পেলেস্-এই যে বাড়ী,
এই যে থানা জেহেলখানা—এই বিচারালয়,
লাট, ছোট লাট তারাই সবে, জজ মাজিষ্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোম্‌রা সমুদয়—
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয়!

৪

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এদেশ তোমার নয়,
আইন কানুনের কর্ত্তা তারা, তাদের স্বার্থ সকল ধারা,
রিজার্ভ করা সুখ সুবিধা তাদের ভারতময়,
তোমার বুকে মেরে ছুরি, ভর্‌ছে তাদের তেরজুরি,
তাদের চার্চ্চে তাদের নাচে তাদের বলে ব্যয়;
একশ রকম টেক্‌স দিবা, ব্যয়ের বেলায় তোমরা কিবা,
গাধার কাছে বাধার বল বাঘের কবে ভয়?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এদেশ তোমার নয়!

৫

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোমার নয়,
যে দেশ যাদের অধিকারে, তারাই তাদের বলতে পারে,
কুকুর মেকুর ছাগল কবে দেশের মালিক হয়?
যে সব বাবু বিলাত গিয়ে, বাবুনীদের সঙ্গে নিয়ে,
প্রসবিয়ে আনছে তাদের শাবক সমুদয়,
'বৃটিশ বরণ্' ব'লে দাবী কর্লে নাকি বিলাত পাবি?
লজ্জাহীনের গোষ্ঠী তোরা নাইক লজ্জা ভয়!
এই যদি রে 'বৃটিশ বরণ' মরণ কারে কয়?

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়,
কা'র স্বদেশে কাদের মেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে,
জোর-জবরে গাড়ীর ভিতর শাড়ী কেড়ে লয়।
নপুংসকের গোষ্ঠি তোরা, জন্ম অন্ধ কাণা খোঁড়া,
ভিস্তিয়ালা পাঙ্খাকুলি—পীলা ফাটার ভয়!
কার স্বদেশে সর্ব্বনেশে এমন অভিনয়?

৭

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়!
'যাহার লাঠী, তাহার মাটী', চিরদিনের কথা খাটি,
এত নহে চা'র পেয়ালা চুমুক দিলে জয়!
দেখ্‌তে যারা কাঁপে ডরে, মার বার আগে আপনি মরে,
ঘুসির বদল খুসি করে—'সেলাম মহাশয়!'
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়!

৮

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়!
সোণার বাঙ্গলা সোণার ভূমি, হীরার ভারত বল্লে তুমি,
ভারত তোমার আসবে কোলে, এই কি মনে লয়?
'সোণা' 'যাদু' মিষ্টি ভাষে, ছেলে মেয়ে কোলে আসে,
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয়!
কবির কথায় তুষ্ট নহে 'ভবি' মহাশয়!

৯

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়!
তাদের রাজ্যে তোদের থাকা, তাদের বেঙ্কে তোদের টাকা,
তাদের নোটে ভারত ঢাকা—বিশাল হিমালয়!
তাদের কলে তোরাই কুলি, তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি,
তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি—ক্ষুধায় মৃত্যু হয়!
তারাই রাজা, তারাই বণিক, তারাই সমুদয়!

১০

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়,
কিসের বা তোর নেপাল ভুটান, সবাই তাদের পায়ে লুটান,
কুত্তার মত পুচ্ছ গুটান—শিয়াল দেখে ভয় !
অই যে ওদের 'কাটামুণ্ড' সত্যই ও কাটা মুণ্ড,
রাহুর যেমন মরা তুণ্ড হা করিয়ে রয় !
কেতুর মত পুচ্ছ লুটান ভুটান মহাশয় !

১১

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়,
করদ মিত্র—নবাব রাজা, সবাই দেখি দক্ষ সাজা,
একটাও নয় মানুষ তাজা—অজার মাথা বয়,
ও গুলা সব মানুষ হলে, কোন্‌দিকে কে যেত চলে,
ডেনিস পেনিস টেনিস খেলে ভারত ভূমি লয় ?
মরুদেশের গরুকাটা ভারত করে জয় ?

১২

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়,
যখন বাদ্‌সা মুসলমান, তখন তাদের 'হিন্দুস্থান',
ইংরেজ 'ইণ্ডিয়া' বলে এখন কেড়ে লয় !
অযোধ্যা কই—'আউধ' এযে, দাক্ষিণাত্য—ডেকান সে যে,
'সিলনে' গিলেছে লঙ্কা—মুক্তা মণিময় !
ডমাউন আর ডিউ গোয়া, চুণি পান্না সোণার মোয়া,
যায় না তাদের ধরা ছোঁয়া, কে দেয় পরিচয় ?
বারণাবত—ইন্দ্রপ্রস্থ, কই সে তোদের সে সমস্ত,
'দিল্লী'র পরে 'ডীল্লি' হলো, আরো বা কি হয় !
স্বদেশ বলে কর্লে দাবি, আর কি তোরা এদেশ পাবি ?
এ নয় তোদের ভারতবর্ষ চির হর্ষময় !

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়,
কই সে শিল্প, কই সে কৃষি, কই সে যজ্ঞ—কই সে ঋষি
কই সে পুণ্য তপোবনে ব্রহ্মা-বিদ্যালয় ?
কোথায় বা সে ব্রহ্মচর্য্য অসীম স্থৈর্য্য, অসীম বৈর্য্য,
কই বা উগ্র সে তপস্যা—ইন্দ্রে লাগে ভয় ?
কোথায় অসীম শৌর্য্যে বীর্য্যে অসুর পরাজয় ?
স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি, চমকে উঠিস্ ভেড়াগুলি,
উইয়ের ঢিব দেখে তোদের শিবির বলে ভয় !
প্রতিজনের প্রতি বক্ষে, কোটী কোটী লক্ষে লক্ষে,
কই সে তোদের দেশভক্তির দুর্গ সমুদয়,
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিসিন্ধু, কই সে বুকের রক্তবিন্দু,
পর্শ থাকুক দর্শনে তার শত্রুকুল ক্ষয় !
লোহার চেয়ে মহাশক্ত, ভক্ত-বীরের মাংস রক্ত,
তাদের বুকের অস্থি দিয়া বজ্র তৈয়ার হয়,
ব্রহ্মাবর্তে প্রথম আসি, তাইতে তারা দৈত্য নাশি,
পুণ্যভূমি ভারতভূমি প্রথম করে জয় !
তোদের 'স্বদেশ' ভারত ছিল, তোদের স্বদেশ নয় ।*

বেদমন্ত্র

"পুনর্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগন্
পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্ ।
পুনশ্চক্ষুঃ পুনশ্রোত্রং ম আগন্ ॥"

আমাদের সেই আয়ু, আত্মা, প্রাণ, মন,
ফিরিয়া আসুক পুন শ্রবণ, নয়ন ।
যাহা হইয়াছে নষ্ট—যাহা আর নাই,
ফিরিয়া আসুক তাহা— পুন তাহা পাই ।

* কবিতাটি 'নব্যভারত' পত্রিকার ২৫শ খণ্ড, ৯ম সংখ্যায় (পৌষ, ১৩১৪) : প্রকাশিত । প: ৪৬৯

আসুক বাহুর বল বুকের সাহস,
ফিরিয়া আসুক সেই বীরকীর্ত্তি—যশ !
আসুক বিশ্বাস ভক্তি আসুক মমতা,
উদ্যম উৎসাহ বীর্য্য জিত-ইন্দ্রিয়তা !
আসুক সে সত্যনিষ্ঠা সংযম বিনয়,
সে তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য সুধা শান্তিময় !
ফিরিয়া আসুক সেই আনন্দ মঙ্গল,
লইয়া পতাকা হস্তে জয় কোলাহল !
সেই বিদ্যা সেই বুদ্ধি আসুক সে জ্ঞান,
বেদমন্ত্রে করে কবি আবার আহ্বান ! *

স্বাধীনতা

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হলে আলি ?
ছিলি নাকি ট্রান্সভালে, কোন দিন কোন কালে,
কিম্বালী জোহান্সবার্গে হীরা সোণা ঢালি ?
নীরক্ত বুয়ার বুক, নাহি তেজ একটুক,
ক্রুগার আগার আজ প্রিটোরিয়া খালি !
সে দেশ ছাড়িলি তাই, সেখানে আদর নাই,
তোর কি আদর জানি আমরা বাঙ্গালী ?
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

২

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
সে দিন লক্ষণ সেন, মুখে উঠে রক্ত-ফেন,
সতর সিপাহী হাতে তোরে দিল ডালি !
খিলিজি দাসের দাস, সে দিল গলায় ফাঁস
আজিও জগৎ যুড়ে দেয় গালাগালি !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

* কবিতাটি 'নব্যভারত' পত্রিকার ২৭শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩১৬) প্রকাশিত। পৃঃ ২২৯

৩

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
যুটে ক'টা বনমেষ, বিসর্জ্জিল অবশেষ,
পশুর ঘৃণিত হেয় ক'রে চতুরালী,
হায় সে পাপীর লোভে, নরকে বাঙ্গলা ডোবে,
বাঙ্গলার ইতিহাসে মাখিয়াছে কালী !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

৪

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
নূতন আলোক মুখে, নূতন আনন্দ বুকে,
নূতন নূতন ভাবে কুটীর ভাসালি !
নূতন নূতন আশা, নূতন নূতন ভাষা,
নূতন এ কাঁদা হাসা কোথা ইহা পালি ?
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

৫

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
যুগ যুগান্তের পরে, আলি বাঙ্গালীর ঘরে,
চঞ্চল পতাকা খানি অঞ্চলে উড়ালি !
কোথা অমরিকা দেশ, সাগরের সীমা শেষ,
আনন্দে ব্রেজিল দেয় ব্রেভো—করতালি ?
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

৬

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
কোথা ছিলি এত দিন, তুরস্ক পারস্য চীন,
সবারি ফিরেছে দিন দেখি আজি কালি !
যে দেশে আসিলি নেচে, সকলি উঠিল বেঁচে,
ফিলিপাইন কিউবা সে কত ভাগ্যশালী !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

৭

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
আমরা নেশায় ভোর, কি বুঝি সম্মান তোর,
দারোগা ডিপুটী মোরা পেদা আরদালী !
ক'—রে সে দেশের কথা, সে আদর সে মমতা,
কেমন জার্ম্মেণ ফ্রেন্স বৃটন ইটালী !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

৮

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
ও মোর 'সোণার কুচি', পবিত্র সরল শুচি,
ও মোর মাণিক 'মাক্কী' মায়ের দুলালী,
কোথা কোন্ রণভুঁই, দাড়ায়ে আসিলি তুই,
কোথারে রুধির রাঙ্গা চরণে মাখালি !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

৯

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
তুই ছুঁলে তৃণ কুটা, সে যে হয় সোণা মুঠা,
দেখিনিরে তোর মত হেন ইন্দ্রজালী !
তুই দিলে ভস্ম-ছাই, কোহিনুর হাতে পাই,
কাঞ্চন কৌস্তুভ হয় মাটী ধূলা বালি !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

১০

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
আবার নাচ্‌রে ছুটে, রঙ্গিন সঙ্গিন যুটে,
নীলগিরি হিমকুটে কর ফালাফালি !
চরণের তলে শব, ভুলি মৃত্যু পরাভব,
জাগুক দীনের দীন অধীন বাঙ্গালী,
রণ রণ ঝন ঝন ঘন করতালি !

* কবিতাটি 'নব্যভারত' পত্রিকার ২৭শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৩১৬) প্রকাশিত। পৃঃ ৩১১

পিপড়া

১

ওগো পিপড়ার সারি,
কোথা হতে কোথা যাও, কোথা ঘর বাড়ী ?
মুহূর্ত্ত অলস নহ, কর্ম্মে ব্যস্ত অহরহ,
নাহিক পুরুষ ভেদ, নাহি ভেদ নারী !
কর্ত্তব্যে জাননা হেলা, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া ফেলা,
তোমরা অধম নহ নীচ দুরাচারী !

২

ওগো পিপড়ার সারি,
তোমরা জাননা ভয়, পরাজয় কারে কয়,
এত যে চরণে দলি, এত টিপে মারি,
কত ফেলি ঝাটাইয়া, তবু ফিরে আস গিয়া,
তোমরা বেহায়া নও, বীরাচারী !

৩

ওগো পিপড়ার সারি,
সাধিতে কর্ত্তব্য কাজ, নাহি কর ভয় লাজ,
পড়ে যদি শত বাজ নাহি যাও ছাড়ি,
অনায়াসে দেও প্রাণ, রাখ বিবেকের মান,
নহ ভীরু কাপুরুষ পলায়নকারী !

৪

ওগো পিপড়ার সারি,
তোমরা যে এত ক্ষুদ্র, তথাপিও আসমুদ্র,
পৃথিবী লুণ্ঠন কর—দিগ্বিজয়কারী,
নাহিক ধনুক তীর, তথাপি তোমরা বীর,
কামান বন্দুক বৃথা, বৃথা তরবারি !

৫

ওগো পিপ্‌ড়ার সারি,
তোমরা উৎসাহে বড়, প্রাণপণে কর্ম্ম কর,
অপূর্ণ রাখনা কর্ম্ম চিরপূর্ণকারী,
নাহি জান নিষ্ফলতা, অধম নীচের কথা,
বিমুখ হইয়ে ফিরে দরিদ্র ভিখারী!

৬

ওগো পিপ্‌ড়ার সারি,
তোমরা যে এত বড়, একতায় কর্ম্ম কর,
একই উদ্দেশ্য লক্ষ্য জীবনে সবারি,
এক মন এক প্রাণ, এক স্বার্থ এক ধ্যান,
ভাই ভাই কেহ কারো নহ হিংসাকারী!

৭

ওগো পিপ্‌ড়ার সারি,
তোমরা উদ্যমে বড়, অবিশ্রান্ত কর্ম্ম কর.
বিরত বিলাস ভোগে ঋষি ব্রহ্মচারী,
অকর্ম্মে ধর্ম্মের নাশ, অকর্ম্ম পাপের ফাঁস,
কর্ম্ম কাম মোক্ষদাতা পাপতাপহারী!

৮

ওগো পিপ্‌ড়ার সারি,
তোমরা সঞ্চয়ে বড়, পৃথিবী ভ্রমণ কর,
জগতের ধন ধান্য আহরণকারী
না পাইলে খুদ কণা, নাহি ফির একজনা,
খালি হাতে কোন দিন নাহি যাও বাড়ী!

৯

ওগো পিপ্‌ড়ার সারি,
তোমরা কৌশলে বড়, একাকী প্রবেশ কর,
সাধু মহাজন কিম্বা বণিক ব্যাপারী!
জানেনা তোমার পাছে, অগণ্য অসংখ্য আছে,
বিপুল বাহিনী কত ধরাজয়কারী!

১০

ওগো পিপ্‌ড়ার সারি,
তোমরা যে এত বড়, নীরবেতে কর্ম্ম কর,
করনা বক্তৃতা—সভা হাটে ঢোল মারি,
জানিলে হৃদয়-মন্ত্র, বায়ু করে বাক্‌যন্ত্র,
আরো সে ঘৃণিত করে অধো অন্ত্র-নাড়ী!

১১

ওগো পিপ্‌ড়ার সারি,
যখন যেখানে যাই, সর্ব্বত্র দেখিতে পাই,
কান্তার প্রান্তরে ঘোর গিরিবন চারী।
নাহিক বিদেশ দেশ—ক্ষমতার একশেষ!
আয়ত্ব করিয়ে লও যেন আপনারি!

১২

ওগো পিপ্‌ড়ার সারি,
তোমরা নহ গো হীন, নরাধম পরাধীন,
গোলাম নফর নহ সেবক ভাণ্ডারী,
নিজে কর নিজ কায, নিজে নিজ মহারাজ,
নিজেই নিজের প্রজা, আইন আপনারি!
ওগো পিপ্‌ড়ার সারি![*]

[*] কবিতাটি 'নব্যভারত' পত্রিকার ২৮শ খণ্ড, ৯ম সংখ্যায় (পৌষ, ১৩১১) প্রকাশিত। পৃঃ ৫৩৩

আমার চিতায় দিবে মঠ

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !
আজ যে আমি উপোস করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্‌ !
সে দিকেতে নাইক দৃষ্টি,
কেবল তোমাদের কথা মিষ্টি,
নির্জ্জলা এ স্নেহ বৃষ্টি
শিল পড়িছে পট্‌পট্‌ ।
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !

২

দুধটুকু নাই নারীর বুকে,
মাড়টুকু নাই দিতে মুখে,
ক্ষুধায় কাতর শিশু ছেলে
ধুলায় লুটে চট্‌পট্‌ ।
শুষ্ক চোখ কণ্ঠতল,
এক বিন্দু নাইক জল,
লোল-রসনা, ভীম-লোচনা
চাহিছে নারী কট্‌মট্‌ !
শত ছিন্ন বসন গায়,
শত চক্ষে লজ্জা চায়,
এমনি দৈন্য এমনি দুঃখ,
যোটে না মোটে ছালার চট্‌ !
নীলগিরি নাহি সে খোপা
শুকনা মরা বিন্না ছোপা,

তৈল বিনা রুক্ষ কেশ
অযতনে শিবের জট্ !
শুষ্ক জীর্ণ শ্মশানকালী
সারিন্দার খোল পেট্টী—খালি,
আকাল ভারে বাঁচান দেহ
কাঁকাল ভাঙ্গা কটিতট !
আমি মর্লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ
ও ভাই বঙ্গবাসী।

৩

পাখীও ত গাছের ডালে,
আপন বাসায় শাবক পালে
আমার নাই সে আশা, নাই সে বাসা,
কেমন বিপদ কি সঙ্কট।
আমি থাকি পরের বাড়ী,
নিয়ে ছেলেপুলে নারী,
নাই যে ডালা কুলা হাঁড়ি—
বাপ দাদার যে ভাঙ্গা ঘট !
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !

৪

আমি আজ
স্বদেশ-চ্যুত বিদেশবাসী
পরদেশে পর-প্রত্যাশী,
না জানিয়া মর্লেম আমি,
ব্যাস কাশী—এ পদ্মার তট !
দেখিনি এমন দারুণ জা'গা,
লক্ষীছাড়া হতভাগা,

তিন পয়সা এক বেতের আগা,—
কি মহার্ঘ, কি দুর্ঘট !
আমি মর্লে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !

৫

হেথা, ছলনা বঞ্চনা খালি,
কে কার ভোগে দিবে বালি।
এ কিষ্কিন্ধ্যায় সবাই 'বালী'
আত্মম্ভরী মর্কট !
জানে না এরা সত্য বাক্য,
ব্যবসা এদের মিথ্যা সাক্ষ্য,
চোর গিরস্থ দু'জনারি পক্ষ
উভচর সব কর্কট !
এরা, শিকড়ে শিকড়ে বাঁশি বাঁধা,
সকল কলার এক ছড়া—কাঁধা,
এদের, অসাধ্য নাই,—স্বার্থে আঁধা,
আকাশে 'ব' নামায় বট,
কুক্ষণে হেথা আসিয়াছি,
এখন, পলাতে পার্লে প্রাণে বাঁচি।
এরা জন্তুর চেয়ে অধম পশু
আত্মগুপ্ত কুর্ম্ম কর্ম্মঠ !
আমি মর্লে, তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ

৬

কথায় বন্ধু অনেক আছে,
কথায় তুলে দিবে গাছে,
বিপদকালে পাই না কাছে
কেমন স্নেহ অকপট,
অভাব দুঃখ শুনলে পরে,
পাছে কিছু চাইব ডরে,

স্বভাব দোষে স'রে পড়ে
চোরের মত দেয় চম্পট !
কত বন্ধু দেশের নেতা,
মুখবন্ধ স্বাধীন চেতা,
কাযের বেলায় আরেক কেতা
হৃদয় ভরা ঘোর কপট,
লেখক মেরে অনাহারে,
লুঠবে টাকা উপহারে,
সাহিত্যের যে কসাই বন্ধু
বিষম ধূর্ত্ত, বিষম শঠ।
আমি মর্লে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ,
ও ভাই বঙ্গবাসী !

৭

যা হোক, আমি শত ধন্য,
কৃতজ্ঞ কৃতার্থম্মন্য
তোমাদের এ স্নেহের জন্য
আজ তোমাদের সন্নিকট।
চিতায় মঠ বা দিবে কেহ,
গড়বে 'ষ্ট্যাচু' অর্দ্ধ-দেহ,
ছায়া-চিত্র রাখ্‌বে কেহ
কেউ বা তৈল চিত্রপট !
করবে তোমরা শোক-সভা
চোখে চস্‌মা শ্বেত জবা,
ওষ্ঠে চুরুট ধূম্রপ্রভা,
করতালি চট্‌চট্‌,
স্বর্গ কিম্বা নরক হতে,
আসব তখন আকাশ পথে,
দেখতে আমার শোকসভা
সঙ্গে নিয়ে অলকট্‌ !

সত্যই কি লজ্জা শরম
বাঙ্গালীরে করেছে বয়কট্ ? *

বজ্র পেলে কই ?

(১)

ক

বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই ?
তোম্‌রা যে গো এক এক জনা,
অতি ক্ষুদ্র জলের কণা,
লৌহ শিলা নও ত কেহ কোমল বাষ্প বই !
বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই ?

খ

বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই ?
গাছ বিরিঞ্চি গিরিচূড়া,
ভেঙ্গে কর গুড়া গুড়া,
ভয়ে ডরে যাই যে সরে' অবাক হয়ে রই !
বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই ?

গ

বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই ?
ওর যে বিষম তেজের চোটে,
আকাশ ফেটে আগুন ওঠে,
হাত পা গিয়ে পেটে সাঁধে শব্দ শুনে অই !
বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই ?

ঘ

বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই ?
জগতে তোমাদের কাছে,
দাঁড়ায় যে কার শক্তি আছে ?

* কবিতাটি 'নব্যভারত' পত্রিকার ২৯শ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩১৮) প্রকাশিত। পৃঃ ২১৮

ক্ষুদ্র হয়ে তোমরা বড় তোমরা সর্ব্বজয়ী !
বজ্র পেলে কই গো তোমরা বজ্র পেলে কই ?

২

ক

বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই ?
আমরা যখন পরস্পরে,
হিংসা ভুলে' একত্তরে,
ঐক্যে সখ্যে লক্ষ্যে বাক্যে সকলে এক হই.
তখন মোদের বীরদাপে,
পায়ের তলে পাহাড় কাঁপে,
হাতের উপর আপনি বজ্র গর্জ্জে উঠে অই !
বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই !

খ

বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই !
ভাই বলিয়া পরস্পরে,
ডাকি যখন স্নেহের ভরে,
কণ্ঠে কণ্ঠে কণ্ঠে বজ্র গর্জ্জে উঠে অই !
পরস্পরে ভালবাসি,
আমরা যখন অট্টহাসি,
আকাশ পাতাল জ্বলে উঠে আঁধার থাকে কই ?
কণ্ঠে কণ্ঠে কণ্ঠে বজ্র গর্জ্জে উঠে অই !

গ

বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই !
আমরা যখন একই জ্ঞানে,
এক বেদনা একই প্রাণে,
পরস্পরে সুখে দুখে ভাইকে বুকে লই,
লোহার চেয়ে তখন দঢ়,
শিলার চেয়ে শক্ত বড়,
কঠিন হতে কঠিন তখন জমাট যখন হই !
বক্ষে বক্ষে লক্ষ বজ্র গর্জ্জে উঠে অই !

ঘ

বজ্র পেলেম কই গো শুন বজ্র পেলেম কই,
ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন মোদের বজ্র যে গো অই!
বজ্র মোদের হৃদয় মর্ম্ম,
বজ্র মোদের অস্থি চর্ম্ম,
অনুকম্পা নই গো মোরা বজ্রকর্ম্মা বই!
বজ্র মোদের শিক্ষা দীক্ষা,
বজ্র মোদের পণ—পরীক্ষা,
বজ্র জাতি বজ্র ধর্ম্ম বজ্র সমস্তই!
বজ্র মোরা পুরুষ নারী,
বজ্রব্রতী বজ্রাচারী,
বজ্র পূজি বজ্র ভজি বজ্র ছাড়া নই!
বজ্র মোদের হিংসা ক্রোধ,
বজ্র মোদের প্রতিশোধ,
বজ্র আশা বজ্র ভাষা বজ্রে সর্ব্বজয়ী!
আমরা বজ্র মন্ত্রজপা,
সে দধীচি মহাতপা
তারি অংশ তারি বংশ গোষ্ঠি তারি হই,
বৃত্র-বধে জীবন দিতে,
আমরা বেড়াই পৃথিবীতে,
বক্ষে বক্ষে লক্ষ বজ্র গর্জ্জে উঠে অই!
আমাদের এ রক্ত বসা,
বজ্রে মাজা বজ্রে ঘষা,
বজ্র মোদের পণ প্রতিজ্ঞা—বজ্র সমস্তই!
ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন মোদের বজ্র যে গো অই!*

* কবিতাটি 'নব্যভারত' পত্রিকার ২৯ খণ্ড, ৭ম সংখ্যায় (কার্ত্তিক, ১৩১৮) প্রকাশিত। পৃঃ ৪৫৩

একলা নিতাই

১

আমি একলা নিতাই,
তোমরা সবাই ঢাক ঢোল,
কেউ পাখোয়াজ কেউ বা খোল,
উঠ্‌ছে তোমাদের হাজার বোল,
পাছে বাওয়া আছে যে ভাই,
আমি ক্ষুদ্র খঞ্জরী,
ফস্‌কে যায় যে শব্দ করি,
বাওয়া শূন্য—হরি, হরি,
হাওয়ায় আমি মরে যাই!
আমি একলা নিতাই!

২

বীণ বেহালা শরদ্ সেতার,
শত তার সুর ধরে তার,
আমার, সুর ধরিতে নাই কেহ আর
এক তারেতে বাজি সদাই,
হার্ম্মোনিয়ম্ একর্ডিনা,
কেউ বাজেনা সঙ্গী বিনা,
আমার, কাড়ার শব্দে চাড়া কাটে,
তাড়া দেয় যে পাড়ার সবাই!
আমি একলা নিতাই!

৩

কোন টেম্‌গোপালের নাতি,
নাইক আমার সঙ্গে সাথী
একলা বসে আঁধার রাতি
শূণ্য মাঠে শিঙ্গা বাজাই!
আমি একলা নিতাই!

৪

আমার ভাবে আমি ভোর,
দোহার পত্র নাহি মোর,
একলা আমি পাছে নাচি
একলা মোড়ায় গান গাই,
আমার তালে আমি থাকি,
চরণে মান চেপে রাখি,
আমার মানে করতালি
জগতে কেউ দিতে নাই !
আমি একলা নিতাই !

৫

একলা আমি কাঁদি হাসি,
একলা ডুবি একলা ভাসি,
অপার অকূল বিপদ রাশি
কূল কিনারা নাহি পাই,
একলা আমি ধরি হাল,
একলা আমি উড়াই পাল,
বিনা দাঁড়ী দিচ্ছি পারি
ঝড় তুফান উজানে বাই !
আমি একলা নিতাই !

৬

পরের রক্ত মাংসে তুষ্ট,
সংসারের সে শকুন দুষ্ট,
আমি তারে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ
অবহেলে নিত্যি দেখাই,
তার সে নিন্দা তার সে গালি,
তারি সে কলঙ্ক কালী !
আমার চখে কৃষ্ণ কালী

কাজল দিছে মদন গোঁসাই !
আমি একলা নিতাই !*

নববর্ষ

১

তোমার মত নূতন বছর আস্‌ছে গেছে কত,
এম্‌নি তর বুক বেঁধেছি আশায় শত শত !
গলায় বেঁধে বুকের বাঁধন কাঁদন হল সার,
হাসির বদল ভারত ভরা ফাঁসির হাহাকার !

২

কালচক্রে বিশ্বরাজ্যে স্ব-তন্ত্র-শাসন,
বিরচিত বিশ্বপতির নিয়ম পুরাতন !
অন্ধ ভারত বন্ধ আঁখি চোখ্‌ মেলে না চায়,
নব গ্রহের শাসন যন্ত্র নূতন পঞ্জিকায় !
সৌর রাজ্যে গৌরবের কি শাসন পরিষদ্‌,
আত্মনিষ্ঠ স্বপ্রতিষ্ঠ সৌভাগ্য সম্পদ !
কোন্‌ বিভাগে কেবা মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হন,
নূতন হর্ষে নূতন বর্ষে নূতন নির্ব্বাচন !
রাহু কেতুর উপপ্লবে উল্কা তারাপাতে,
যুগ যুগান্ত কল্পে কল্পে আঘাতে সংঘাতে,
হউক ছাই হউক ভস্ম হউক রেণুকণা,
হয় না রুদ্ধ আত্মবুদ্ধ চৈতন্য-চেতনা,
কি অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃভাব প্রীতির আকর্ষণ,
ছোট বড় পরস্পরে অভেদ আত্মা মন !
কেমন উদ্যম ! কেমন উত্থান ! কেমন অভ্যুদয় !
একাগ্রতা একপ্রাণতায় কেমন চির জয় !

* কবিতাটি 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রিকায় ১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যায় (পৌষ, ১৩১৮) প্রকাশিত। পৃঃ ৩২৫

কি আদর্শ নব বর্ষ কর প্রদর্শন!
রুদ্ধ শিরায় ক্রুদ্ধ রক্ত স্বপ্নে করে রণ!

৩

মর্‌তে হবে—মর্‌ব তাহে ক্ষতি কিছু নাই,
পচা মরণ দিওনা আর তাজা মরণ চাই!
সিংহ মরে, ব্যাঘ্র মরে মহিষ মরে বনে,
বন্য পশুর ধন্য জীবন আত্ম-সমর্পণে!
ক্ষুদ্র পোকা সেও মরে রুদ্র পিপাসায়,
জ্বলন্ত আগুনে সেও আলোর মরণ চায়!
মানুষ আমি মরব নাকি অন্ধ কারাগারে,
কাপুরুষ পাতকীর মত চরণ প্রহারে?
ব্যোমের মত বক্ষ চাহি দিগ্‌দিগন্ত খোলা,
জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের মত চাই সে গুলি গোলা!
কালান্ত তার তেজের ছটা জ্বলন্ত প্রলয়,
মৃত্যুমরা মৃত্যু চাহি জীবন-জ্যোতির্ম্ময়!

৪

লক্ষ বর্ষ বক্ষ ভরা লক্ষ অঙ্গীকার,
অপূর্ণ আনন্দ-শূন্য আকুল-উপহার!
জীর্ণ অস্থি শীর্ণ মাংস মর্ম্ম গ্রন্থি ছিঁড়া,
ক্ষুৎপিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ রক্তশূন্য শিরা,
রোগে ক্লিষ্ট পদে পিষ্ট হা অদৃষ্ট লীলা!
পাজর ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা লেও সে ফাটা পীলা!
শক্তিশূন্য হস্ত পদ ভক্তি-শূন্য প্রাণ,
চর্ম্ম মর্ম্ম-স্পর্শ-শূন্য—আঘাত অপমান,
আশা ইচ্ছা যোগ তপস্যা কর্ম্ম ধর্ম্ম সহ,
ইহকাল পরকাল আমার সকল লহ লহ!
লহ পুত্র লহ কন্যা লহ ভগ্নী ভাই,
অভিমন্যুর মত বর্ষ অভয় মৃত্যু চাই *

* কবিতাটি 'নব্যভারত' পত্রিকার ৩০শ খণ্ড, ১ম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩১৯) প্রকাশিত। পৃঃ ১৯

তৃণ

১

আম্‌রা তৃণ—ঘাস,
এই যে বিশাল পৃথিবীটা,
আমাদেরি বাস্তু ভিটা,
বাস্তবিকই মোদের এটা,
আদিম অধিবাস !
আম্‌রা আছি জলে স্থলে,
গিরি গাত্রে সাগর তলে,
প্রান্তরে কান্তারে করি
বসত বার মাস !
আম্‌রা চির জীবন পন্থী,
আম্‌রা চির মরণ মন্থী,
মোদের প্রতি মর্ম্ম গ্রন্থি,
জীবন জয়োচ্ছ্বাস !
আমাদের নাই মৃত্যু জরা,
উদ্যম অধ্যবসায় ভরা,
কঙ্করে অঙ্কুর মেলে,
নবীন অভিলাষ !

২

আম্‌রা তৃণ—ঘাস,
আমাদের ক্ষুদ্র বলি,
তোম্‌রা যাও চরণে দলি,
কথায় কথায় রঙ্গ কর—
ব্যঙ্গ উপহাস,
জগৎটা তোমাদের জন্য,
ভাগী অংশী নাইক অন্য,
আম্‌রা যত অকর্ম্মণ্য
তোমাদের বিশ্বাস !

তাই সে মোদের নাশে রত,
তোম্‌রা আছ অবিরত,
ক্ষুরপী কোদাল লাঙ্গল দিয়ে
নিত্য কর চাষ!

৩

আম্‌রা তৃণ—ঘাস,
তোমাদেরও শস্য ফলে,
পৃথিবীটা ক'দিন চলে,
কয়টা জীবের বল উহা,
কত দিনের গ্রাস?
সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অণু,
কত জীব যে ক্ষুদ্র তনু,
পিপীলিকা কীট পতঙ্গ
থাকবে উপবাস?
ছাগল গরু ঘোড়া ভেড়া,
অনাহারে মর্‌বে এরা,
তাদের ছেড়ে বাঁচবে তোম্‌রা
এই কি মনের আশ?
কি অহঙ্কার কি গরিমা,
স্পর্দ্ধার নাইক পরিসীমা,
লাজে মরি দেখে এমন
বিদ্যা পরকাশ!

৪

আম্‌রা তৃণ—ঘাস,
কীটানুকীট পশু পাখী,
আম্‌রা জগৎ বাঁচায়ে রাখি,
আম্‌রা যোগাই সবার অন্ন
নইলে উপবাস!
আত্মদানে আম্‌রা ধন্য,
পবিত্র কৃতার্থমন্য,

দধীচির কি বিশ্ব হিতের
এমন অভিলাষ ?
পরসেবা জীবন ব্রত,
তাই আম্‌রা পদানত ;
বিনয়েতে হলে নত
মানের হয় কি হ্রাস ?

৫

আম্‌রা তৃণ—ঘাস,
হাজার হলে ঘৃষ্ট পিষ্ট
হইনা ক্লান্ত হইনা ক্লিষ্ট,
নিরুৎসাহ নিরুদ্দিষ্ট
নিরাশ নিরাশ্বাস !
পণ—প্রতিজ্ঞা নাহি টলে,
নিত্য দহি দাবানলে,
নিত্য সহি বর্ষা বাদল,
প্রলয়ের উচ্ছ্বাস,
কর্ম্মে মোদের নাইক ক্ষান্তি,
ধর্ম্মে মোদের নাইক ভ্রান্তি,
চাইনা অবসর কি শান্তি
চির রণোল্লাস !
আম্‌রা ত জানিনা ভয়,
মরণ কিম্বা পরাজয়,
আমাদের এ জীবন কেবল
জয়ের ইতিহাস !
জন্মভূমি—জন্ম মাটী,
আম্‌রা ভালবাসি খাটি,
বুকে ঢেকে বুকে ছাটি,
বদ্ধ স্নেহ পাশ,
মোদের হলে ছাড়াছাড়ি,
মরঁণ যে হয় দু'জনারি,

কেহবা হই মরুভূমি
কেউ বা মরা ঘাস।
দেখে মোদের কর্ম্ম-শক্তি,
অতুলন এ দেশ ভক্তি,
সেবা ধর্ম্মে আনুরক্তি
নিষ্কাম প্রয়াস,
মহানন্দে তৃণের অর্ঘ্য,
শির পেতে লয় সুর বর্গ,
কার বল অলকা স্বর্গে
এমন জয়োচ্ছ্বাস?
আমরা তৃণ—ঘাস! *

কেন বাঁচালে আমায়

কেন, বাঁচালে আমায়?
আমি ভেবেছিনু হরি, এবার করুণা করি,
ঘুচাইবে অভাগার এ ভবের দায়,
যত দুঃখ যত ক্লেশ, সকল হইবে শেষ,
কাঁদিতে হবে না আর ব্যথা বেদনায়!
আমি ত ভাবিনি রোগ, ভেবেছি মাহেন্দ্র যোগ,
তিলে তিলে পলে পলে আমার আশায়,
ভেবেছি মরণ মাঝি, লইতে আসিবে আজি,
অচিরে ভেটিব গিয়ে তব রাঙ্গা পায়!

* কবিতাটি 'সৌরভ' পত্রিকার ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় (মাঘ, ১৩২১) প্রকাশিত। পৃঃ ১১৷

২

কেন, বাঁচালে আমায় ?

চাল ডাল তেল নুন, আবার ভাবিয়া খুন,
জ্বালালে আগুন ফিরে হৃদি কলিজায়,
ক্ষুধিত সন্তান বুকে, গৃহিনী বিষণ্ণ মুখে,
সম্মুখে আসিয়া সে যে আবার দাঁড়ায় !
মুখে নাহি ফোটে ভাষা, মূর্ত্তিমতী ক্ষুৎপিপাসা,
গরাসে গরাসে পেলে গ্রহ তারা খায়,
ভয়ে ভীত চিত্ত মম, অচেতন শব সম,
আতঙ্কে তরাসে তার চরণে লুটায় !

৩

কেন, বাঁচালে আমায় ?

মহাজন খাতা হাতে, কিবা সন্ধ্যা কি প্রভাতে,
আবার দিবসে রাতে আসে তাগাদায় !
গেলেও যমেব বাড়ী, করিবে নীলাম জারি,
শমনেব বাড়ী এরা 'শমন' লটকায় !
দোকানী বাঘের মত, রাগে কটু কহে কত,
ভয়ে হয়ে থতমত ধবি তার পায়,
নরক ভোগের বাকি, আর কিছু আছে নাকি,
বাঁচালে করুণাময় এই করুণায় ?

কেন বাঁচালে আমায় ?

ছেলের বইয়ের কড়ি, যোগাইতে প্রাণে মরি,
কোথা পাব ছাতি জুতা ছেঁড়া তেনা গায় !
অবোধ বুঝেনা আহা, জেদ্ করে চায় তাহা,
সে জানে—বাবাব কাছে চেলে পাওয়া যায় !
কিন্তু সে মনের দুঃখে কাঁদ কাঁদ চাঁদ মুখে,
অভিমানে যে সময় ফিরে নিরাশায়,
তোমার 'বাবার প্রাণ', থাকিলে হে ভগবান,
দিতে না এমন প্রাণ দেখিতে আমায় !

৫

কেন, বাঁচালে আমায় ?

গৃহিণীর ছিল যাহা, বন্ধক রাখিয়া তাহা,

সে দিন আনিয়া আহা দিল চিকিৎসায়,

আজ সেই খালি হাতে, শাক ভাত দিতে পাতে,

হঠাৎ পড়িল মনে ক্ষতি লাভ তায় !

ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি, মরণে বাঁচনে এক-ই,

দুয়েতেই খালি হাত—নাহিক উপায়,

মরিলে থাকিত মূল, বেঁচে যে'ত জাতিকুল,

বিধাতা তোমার ভুল—দুই কুল যায় !

৬

কেন, বাঁচালে আমায় ?

কত করি 'বাড়ী বাড়ী', ফিরিলাম বাড়ী বাড়ী,

চাহেনি পুরুষ নারী স্নেহ করুণায়,

শেষে করিলাম বল, আছেত গাছের তল,

না হয় শুইব তাহে ভূমি বিছানায় !

ইহাতেও হলে বাদী, জানি না কি অপরাধী,

কি দোষে হয়েছি বল দোষী তব পায়,

পদ্মায় লইল চাটি, না রাখিবে ভিটা মাটি,

না রহিল তৃণটুকু শেষের সহায় !

কি বিকট অট্ট হাসে, গর্জ্জিয়া ফোঁপায়ে আসে,

আকাশ পাতাল যেন গ্রাসে সমুদায়,

সহস্র তরঙ্গ বাহু, মেলিয়া আসিছে রাহু,

কত জনমের যেন ক্ষুধা পিপাসায় !

৭

কেন, বাঁচালে আমায় ?

এখন কোথায় যাই, আপনার কেহ নাই,

কে দিবে চরণে ঠাঁই স্নেহ করুণায়,

কে লইবে বুকে তুলি, অনাথ সন্তান গুলি,

কে দিবে আশ্রয়, দেখি দীন অসহায় !

দৈত্যরাজ বলি সম,　　　ত্রিদিব ভূতল মম,
　　　হরিয়া লইলে হরি যদি ছলনায়,
তবে সে বামন বেশে,　　　পতিত অধমে এসে,
　　　জীবনের অবশেষে রাখ রাঙ্গাপায়!*

*কবিতাটি 'সৌরভ' পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩২২) প্রকাশিত। পৃঃ ২৬